ভাঙা বন্দর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কমলা পাব্লিশিং হাউস
৮।১-এ, হরি পাল লেন : কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

ভাদ্র ১৩৫২

দুই টাকা

শ্রীসত্যচরণ দাস কর্ত্তৃক ৯এ, হরি পাল লেনস্থ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং
ওয়ার্কস্ এ মুদ্রিত ও ৮।১এ, হরি পাল লেন হইতে প্রকাশিত

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

নতুন এবং অপেক্ষাকৃত পুরোণো কয়েকটি গল্পের সমষ্টি 'ভাঙা-বন্দর'। 'আনন্দ বাজার' 'যুগান্তর' 'বসুমতী' 'শনিবারের চিঠি' 'অলকা' 'বর্ষশেষ' প্রভৃতি কাগজে লেখাগুলি বেরিয়েছিল। শেষ গল্প 'আত্মহত্যা' একান্ত হাতে-খড়ির রচনা—প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৪ সালের 'বিচিত্রা' পত্রে; ইতিহাসের ধারা রক্ষার জন্য সে যুগের এই একটি মাত্র লেখাকে এখানে স্বীকৃতি দিলাম।

বইটির প্রকাশ-ব্যাপারে বন্ধুবর বিশু মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সিটি কলেজ
কলিকাতা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাঙা বন্দর

এখন যেন সে সব রূপকথা।

এক নয়, দুই নয়, তিন তিনশো ঘর। যেখানে লোহার বড় পুলটার তলায় খালের ওপর মস্ত বড় বাঁধা ঘাট নেমেছে, ওরই আশেপাশে সমস্ত পাড়াটা জুড়েই বসতি ছিল ওদের। সবুজ ঘন শ্যাওলার নিচে আজ প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে বটে, কিন্তু ভালো করে তাকালে এখনো স্পষ্ট পড়া যায় : সুখমণি দাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সন ১২৯৫।

রূপোপজীবিনী। এক নয়, দুই নয়, তিন তিনশো ঘর। এই বন্দরই কি সেদিন এমন ভেঙেচুরে সুনন্দার জলে লোপ পেতে বসেছিল ? আজ যেখানে বড় বড় মাল বোঝাই ফ্ল্যাট এসে নোঙর করে, সেখানে আগে ছিল বিখ্যাত চীনেবাজার। তখন এই চীনেবাজারে প্রত্যেকদিন লাখ লাখ টাকার সুপুরির কারবার চলত, রাতের বেলা দেড়শোটা ডে-লাইটের আলোয় ঝলমল করত সুনন্দার জল।

আজ সে চীনেবাজার নদীর অতল জলে ডুব দিয়েছে। সেই জমজমাট ব্যবসার চিহ্ন-স্বরূপ এক টুকরো ইটকাঠও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বন্দরের পশ্চিম পাশে যে মগবাজারটি আজ পর্যন্ত টিকে আছে, কঙ্কালের কঙ্কাল বললেও যেন তাকে বেশি সম্মান দেওয়া হয়। আর সাহাপট্টি! এই তিনশো রূপোপজীবিনীদের পায়ে হাজার হাজার টাকা যারা প্রতি রাত্রে খোলামকুচির মতো ছড়িয়ে দিত, তাদের জঙ্গলে ঢাকা বড় বড়

বাড়ির ফাটলে আজ যত বিষাক্ত সাপ এসে বাসা বেঁধেছে। তাদের বৎসামান্য বংশধরেরা দু'চারটি ছোটোখাটো কারবারের ভেতর দিয়ে এই বিখ্যাত বন্দরটির নাম কোনমতে জীইয়ে রেখেছে এখনো।

ষ্টিমারঘাটে হারাণের ছোট স্টলটিতে বসে চা খেতে খেতে অনেক কথা শ্রীধর মিত্তিরের মনে পড়ে।

সদর নয়, মহকুমাও নয়। তবু অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষীর মতো ছোট একটি মিউনিসিপ্যালিটি আজ অবধি রয়েছে। দু'একটি রাস্তার মোড়ে জরাজীর্ণ কাঠের পোষ্টে আধভাঙা চৌকোণা আলোগুলো এখনো কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় মিটমিট করে। ওয়াটার ওয়ার্কসের বড় চৌবাচ্চাটা ভাঙাচোরা অবস্থায় শূন্যে ঝুলে রয়েছে, রিজার্ভ ট্যাঙ্কের জলে এখন বাসন মাজার কাজ চলে।

বহুদিন থেকে শ্রীধর মিত্তির এই মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান। আজ পর্যন্ত তাঁর সে গৌরবের আসনটির কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। শুধু ভাইস-চেয়ারম্যানও নয়। এখানকার ছয়-আনি জমিদার কাছারির তিনি নায়েব এবং সব দিক থেকে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

হারাণের স্টলে হাতল-ভাঙা একটা চেয়ারে উবু হয়ে বসে শ্রীধর মিত্তির জিজ্ঞাসা করলেন: তারপর, কাল ত্রিনাথের গান কেমন শুনলে হে?

—উঃ, সারারাত ঘুমুতে পারিনি!—হারাণ মস্ত একটা হাই তুললে।

মিত্তির মশাই হাসলেন: সারা রাত্তির! তার মানে, ছোট কলকেতে দু'একটা—হেঁ—হেঁ—ইঙ্গিতপূর্ণ একটা টানের ভেতর দিয়ে তিনি কথাটা শেষ করলেন।

—রাম, রাম, কী যে বলেন! ছিঃ ছিঃ! হারাণ প্রকাণ্ড রকমে

জিভ কাটল। স্বাভাবিকের চাইতে আর এক ইঞ্চি বেশি। হয়তো নিছক রাত্রি জাগরণের জন্যেই তার চোখের লাল রঙটা এখনও মিলিয়ে যায়নি।

মিত্তির মশাই বললেন, তাতে আর দোষটা কি ভায়া? দেব সেবা, অন্যায় তো নয়। আর গানখানাই বা কি? না—

"আমার ঠাকুর তের্‌নাথ কিছু নাহি চায়,
এক পয়সার গাঁজা দিয়া তিন কলকি সাজায়
রে সাধু ভাই,
দিন গেলে তের্‌নাথের নাম লইয়ো।"—

অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল হারাণ। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে বললে, নতুন মাখন-বিস্কুট আনিয়েছি মিত্তির মশাই, দেব দু'খানা?

অনাসক্তের মতো শ্রীধর মিত্তির বললেন, দাও।

সামনে সুনন্দার জল জোয়ারের বেগে ফুলে উঠেছে, ফেঁপে উঠেছে। আস্তে আস্তে দুলছে ষ্টিমারঘাটের পণ্টুনটা। নদীর সমস্ত মাঝখানটা জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বেড়াজাল—বাঁশের আগাগুলো কালো কালো মাথার মতো ভাসছে। ওপারের খেয়া নৌকোখানা সকালের প্রথম পাড়ি জমিয়েছে, ওখানা এ পারে এসে পৌঁছুলে তবে বন্দরের বাজারে দুধ উঠবে।

ত্রিনাথ—ত্রিনাথ! ত্রিনাথের পূজোর সে সব আয়োজন এখন কি এরা কল্পনাও করতে পারে! এখন যেখানে রোজ সকালে মানপাশা-সরমহলের "কেরায়া" নৌকাগুলো যাত্রীর আশায় লগি পুঁতে বসে থাকে, ঠিক ওইখানেই ছিল কালীমোহন সাহার গদি। লোকে বলত, বড়ঘর। ছোটো খাটো যে কোনো একটা কিছুকে উপলক্ষ্য করেই ওখানে ত্রিনাথের পাঁচালি বসত। আশেপাশের দশখানা গাঁয়ের যত গাঁজাখোর সব এসে

ভিড় জমাত সেদিন। এক রাত্রে এক সের গাঁজা পুড়ত, তিরিশটা কলকে ফাটত এবং তিন মণ রসগোল্লা যে মন্ত্রবলে কোথায় উড়ে যেত তার আর ঠিকঠিকানাই মিলত না।

শুধু কি গাঁজাখোরের তাণ্ডব চীৎকার! ঢপও হত মাঝে মাঝে। গৌরাঙ্গিণীর ঢপ বিখ্যাত ছিল সে যুগে। অমন দরদ দিয়ে পদাবলী গাইতে মিত্তির মশাই কাউকেই শোনেন নি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কত কাণ্ড হয়ে গেল ওই গৌরাঙ্গিণীকে নিয়ে।

একদিন বর্ষার সন্ধ্যায় কালীমোহনের ভাইপো ব্রজমোহন একখানা ধারালো রামদা দিয়ে খুড়োকে টুকরো টুকরো করে কাটল। সে দৃশ্য মনে পড়লে গা এখনও ছমছম করে ওঠে। রক্তনদীর মাঝখানে পড়ে রয়েছে কালীমোহনের পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড শরীরটা। পেটের ঠিক মাঝখান দিয়ে রক্তের ছিটে দেওয়া হলদে একটা চর্বির পিণ্ড বাইরে ঝুলে পড়েছে, অর্ধছিন্ন শ্বাসনালীটা রাক্ষুসে ধরণে হাঁ করে রয়েছে, আর তাই থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত তখনো কাঁধের দু'পাশ বয়ে মাটিতে চুঁইয়ে পড়ছে।...

বাঁশি বাজিয়ে সকাল বেলাকার এক্সপ্রেস স্টিমারঘাটে এসে ভিড়ল। দোতালার রেলিঙে যাত্রীদের সগুোজাগ্রত চোখের অলসদৃষ্টি। "হাফিজ, হাফিজ" চীৎকার করে কালিমাখা পায়জামা পরা খালাসিরা মোটা মোটা তারের দড়ি ছুঁড়ে ফেলতে লাগল,—তারপর কয়েক মিনিট ধরে বাঁধাবাঁধি, কষাকষি। যাত্রীদের ওঠা নামা, ডাকের ব্যাগ, খবরের কাগজ, বাঁশির গম্ভীর আওয়াজ—চাকার ঘায়ে জল ফেনায় ফেনায় ভরে উঠল। কিছুক্ষণ পরেই আর সাড়াশব্দ নেই—। সুনন্দার জলে ধরল ভাঁটার টান, পণ্টুনটা চুপচাপ পড়ে ঝিমোতে লাগল। কেরায়া নৌকার মাঝিরা ছোট ছোট ছিপ ফেলে পণ্টুনের তলা থেকে বোয়াল মাছ ধরছে, সকালের রোদে থেকে থেকে এক একটা মাছ রূপোর মতো চিকচিক করছিল।

একটা বিড়ি ধরিয়ে শ্রীধর মিত্তির ভাবতে লাগলেন। এই বন্দর হয়তো আবার তেমনি করেই উঠবে বড় হয়ে। সামনে ওই যে তেলের কলটা আজ প্রায় তিন বছর ধরে তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে, ওই মিলটাও হয়তো চলতে সুরু করবে সেদিন। আবার এই বন্দরে কোটি টাকার লেন-দেন চলবে, দক্ষিণের তালবনটার পাশ ঘেঁষে চীনে-বাজার বসবে আবার।

—হাঁসের ডিম আছে হারাণবাবু?

ঠিক মিত্তির মশাইয়ের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে একটি যুবতী মেয়ে। কাপড় চোপড়ের ধরণ দেখলেই তাকে চেনা যায়। কিন্তু বারবনিতা হলেও এখনো তার এক-ধরণের শ্রী আছে।

কয়লার উনুনটাতে বাতাস দিতে দিতে হারাণ বললে, হাঁসের নেই, মুরগীর আছে। নেবে?

—মুরগী? মুরগী কি হিঁদুতে খায় বাবু? থাক, একটা সিগ্রেট দাও বরং।

হারাণ সিগারেট বার করলে।

—কাঁচি? কেন তোমার ঠেঁয়ে ক্যাভেণ্ডার নেই? একটু কড়া না হলে আবার—

মেয়েটি হাসল।

একটু রসিকতার সুযোগ পেয়ে যেন বর্তে গেল হারাণ। বললে, কড়া? খুব ভালো দা-কাটা তামাক আছে, চাও তো দিতে পারি।

মেয়েটি মুখের একটা অপরূপ ভঙ্গি করলে। তার শরীরের সর্বত্রই কেমন যেন একটা ছন্দ ছড়িয়ে রয়েছে। আকারে-প্রকারে, চলায়-ফেরায় সে ছন্দটি যেন আলোর মত ঠিকরে পড়ে।

—তোমার সঙ্গে এখন আমার মস্করার সময় নেই বাপু। আঁচল দুলিয়ে সে দোকানের ভেতর থেকে বাইরে নেমে গেল।

কয়লার উনুনটা প্রায় ধরে উঠেছে। এলুমিনিয়মের টোল খাওয়া অপরিচ্ছন্ন কেটলিটা তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে পরিতুষ্ট মুখে হারাণ বললে, চিনলেন ?

শ্রীধর মিত্তির সপ্রশ্নভাবে তাকালেন : না, সেইটেই তোমায় জিগেস করতে যাচ্ছিলুম। এ বিশ্বেশ্বরীটি আবার কোত্থেকে আমদানী হল ?

—আরে, এ যে মালতী। রামকুমার পোদ্দারের ছেলে জগন্নাথকে চেনেন না ? সেই-ই কোত্থেকে জুটিয়ে এনেছে, একরকম তারই রক্ষিতা বললেই চলে।

মিত্তির মশাইয়ের মুখখানা কালো হয়ে উঠল। তাঁর মনে কোথায় যেন আকস্মিক ভাবে একটা আঘাত লেগেছে। এই একটা ঘর এই ভাঙা বন্দরে কোনোরকমে টিকে আছে এখনো। রামকুমার পোদ্দার কখনো হাঁটুর নিচে কাপড় পরেনি, আধপেটা খেয়ে দিন গুজরান করেছে। বুড়ো অথর্ব হয়েও যখন সে হাঁটতে পারত না, তখনও সে এতটুকু আলসেমিতে সময় কাটায় নি। সকালের রোদে দাওয়াটা ভরে গেলে সেই রোদে বসে সে দড়ি পাকাত। আর কিছু না হোক, এই দড়িগুলো তো অন্তত সংসারের কাজে লাগবে।

আর সেই রামকুমার পোদ্দারের ছেলে এই জগন্নাথ। প্রত্যেক শনিবারে সে শহরে যায়, ফ্ল্যাস আর বিলিতী মদে দুটো দিন কাটিয়ে আসে। কোনো অজ্ঞাত কারণে মাসিক একবার করে কলকাতা না গেলে তার চলে না।

শ্রীধর মিত্তির উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এই বন্দর! আজ পঁচিশ বছর ধরে তিনি চোখের ওপর এর জীবনের গতিটা লক্ষ্য করে আসছেন। তখন এমনিভাবে মাড়োয়ারীরা এসে দাদন দিয়ে সুপুরির বাগানগুলো একচেটিয়া করে নেয়নি, লাখে লাখে টাকার মুনাফা প্রত্যেক বছর ভাটিয়ারা

টঁ্যাকে গুঁজে নিয়ে যেতে পারেনি। রাধানাথ সাহা, হরিমোহন সাহা তখন এ তল্লাটের মুকুটহীন রাজা। তখন বড় বড় ডেসপ্যাচ স্টিমার এসে নদীর বুক জুড়ে থাকত—তখন কোথায় ছিল ঝালকাঠি বন্দরের এত ডাক-হাঁক, এত জাঁকজমক।

কিন্তু সে সব দিন স্বপ্নের মতো ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেই রাধানাথ সাহা বটে-অশথে বিয়ে দিয়ে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দিলে, যথাসর্বস্ব নিবেদন করে বসল সারদা বোষ্টমীর পায়ে। আর হরিমোহন সাহার ছেলেরা? তাদের থ্যামটার দলের নামই এক-আধটু যা টিকে আছে—অত বড় ব্যবসাটা জলের লেখার মতো নিঃশেষে মুছে গিয়েছে বললেই হয়।

শ্রীধর মিত্তির বললেন, উচ্ছন্নে যাবে, তারই পথ খুঁজছে আর কি! এতদূর যখন হয়েছে, তখন আর বড় বাকীও নেই।

কয়লার উনুনটাতে আবার জোরে জোরে বাতাস দিতে দিতে হারাণ বললে, ইচ্ছে করে উচ্ছন্নে গেলে কে ঠেকিয়ে রাখবে বলুন?

শ্রীধর মিত্তিরের কণ্ঠস্বর বেদনার্ত হয়ে এল: উঃ, এত কষ্টের টাকা! একটা পয়সাকে বুড়ো বুকের এক ফোঁটা রক্ত বলে মনে করত। সেই সব পয়সা এমনি ভাবে যাচ্ছে অবিদ্যের সেবায়!

হঠাৎ যেন মিত্তির মশাই ক্ষেপে উঠলেন: একটা বন্দুক দিতে পারো আমাকে, বন্দুক?

চোখ দুটো কপালে তুলে হারাণ বললে, বন্দুক? বন্দুক দিয়ে কী করবেন?

—গুলি করব—গুলি করে মেরে ফেলব সব। অঁ্যা, বলো কি হে! এমনি করে সবই গেলে বন্দরের আর রইল কি? আর ক'দিন পরে যে মানুষ থাকবে না এখানে। চরে বেড়াবে—শেয়াল শকুন চরে বেড়াবে খালি।

হারাণ চিন্তিতের মতো মাথা নাড়তে লাগল।

—আজ্ঞে সে তো ঠিক কথা। কিন্তু যার পাঁঠা সে যদি ন্যাজের দিকে কাটে, তা হলে আপনি আমি আর—

—পাঁঠা? কার পাঁঠা? তুমি বলতে চাও এ বন্দরে আমাদের কিছু নেই? উঃ, কী ছিল আর কী হয়েছে! তখন কোথায় থাকত নারায়ণগঞ্জ আর কোথায় দাঁড়াত ঝালকাঠি! হাওয়ায় উড়ে আসত টাকা—আকাশে আগুনের মতো উড়ত টাকার ফুল্‌কি। পাট আর সুপুরির মরশুমে এখানে এসে জড়ো হত সমস্ত বাংলাদেশ। আর আজ—বল কি, দুঃখ হয় না?

হারাণ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে। বললে, কী আর করবেন বলুন? ভগবানের মার বই তো নয়।

—ভগবান? ভগবান এর মাঝে কোত্থেকে এলো হ্যা? নদীতে চড়া পড়ে গিয়েছে? বরিশালের বাগানে আর সুপুরি হয় না? মদে আর মেয়ে মানুষে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে, আর দোষ হয়ে গেল ভগবানের?

হারাণ কথা খুঁজে পেল না।

—তুমি দেখো হারাণ, এ বন্দর আবার জোড়া লাগবে—ভাঙা বন্দর চিরদিনই ভাঙা থাকবে না। একবার তেলের কলটা চললেই হয়। সব তৈরি হয়ে আছে—বিরেনব্বুইখানা কলের ঘানিতে সর্ষে ফেলে তেল বের করবে, সোজা কথা তো নয়। কিন্তু এ-ও বলে রাখছি, তো হলে মিউ-নিসিপ্যালিটির চৌহদ্দিতে আর একঘরও পেশাকার থাকতে দেব না আমি। চাল কেটে সব তুলে দেব—নিশ্চয়ই।

হারাণ বোকার মতো খানিকটা হেসে বললে, যা বলেছেন।

বেলা বেড়ে উঠেছে। আকাশে অসংখ্য উড়ন্ত গাংচিল; ভাটার টানে নদীর বুকের ওপর দিয়ে কচুরীর স্তর ভেসে চলেছে। ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়ায় ফুলে উঠেছে মহাজনী নৌকোর পাল। ওপারের মুসলমানদের গ্রাম থেকে কালো কালো একদল ছেলেমেয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সুনন্দার জল তোলপাড় করে তুলছে। পণ্টুনের পাশে বাঁধা কেরায়া নৌকাগুলো থেকে বাতাসে চারিয়ে যাচ্ছে রসুন মেশানো মাছের ঝোল আর ফুটন্ত ভাতের গন্ধ।

সাহাপট্টির বাঁধা ঘাটে মিত্তির মশাই স্নান করতে এলেন। ঘাট নদীতে নয়—খালের ওপর। লোহার বড় পুলটার তলায় রাণা দেওয়া পাথর বাঁধান মস্ত ঘাটটা। নীল শ্যাওলার তলায় প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এলেও এখনো পড়া যায়ঃ সুখমণি দাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সন……

প্রথমে স্নান, তারপরে আহ্নিক। কিন্তু বেশিক্ষণ জলে থাকবার জো নেই আজকাল। খালের জলে বেজায় "কামটের" উপদ্রব হয়েছে ইদানিং। সেদিন কোন্ এক বৈরাগীর পা কেটে নিয়েছে।

আহ্নিকে মন বসতে চায় না। নিজের অজ্ঞাতেই গুরুমন্ত্র ভুলে গিয়ে মিত্তির মশাইয়ের সমস্ত চিন্তা চেষ্টা যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঘাটের এ পাশে বসে তিন চারটি যুবক সাবান মাখছে। তারাই আলোচনা করছিল। ভাঁটার মুখে নেবে আসা জলের প্রখর কলতানের ভেতর দিয়েও তাদের চাপা আলোচনা কানে এল।

—মালতী—হ্যাঁ হ্যাঁ মালতী। কাল যা কেত্তন গাইলে মাইরি, কী বলব?

—ওই বারোয়ারীতলায় তো? তা হলে যেতেই হবে আজ সন্ধ্যেয়। কী গাইলে বল দিকি? গরানহাটী? মনোহরশাহী? ঢপ? সেই যে—'না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ,—না ভাসাইয়ো জলে'—

আহ্নিকের মন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে মন থেকে। মিত্তির মশাইয়ের সমস্ত মস্তিষ্কটা যেন মশালের মতো জ্বলে উঠতে চায়। মালতী—সেই মেয়েটা। প্রদীপের চারপাশে যেন পুড়ে মরবার জন্যেই উড়ে বেড়াচ্ছে পতঙ্গের দল। দস্যু আর অগ্নিভীতি নিবারক লোহার সিন্দুককে ফাঁকি দিয়ে সোনার তালগুলো বেরিয়ে আসছে—হাওয়ায় হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে বুদ্বুদের মতো। অথচ রামকুমার পোদ্দার কোনোদিন হাঁটুর নীচে কাপড় পরেনি—আধপেটা খেয়ে ইঁদুরের মতো শুকনো, চিমসে হয়ে মরেছে লোকটা।

অসহ্য বিরক্তি আর ক্ষোভে ভিজে কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে শ্রীধর মিত্তির নিঃশব্দে ঘাট থেকে উঠে গেলেন।

জমিদারী কাছারীর কাজ।

সামনে কাঠের হাত বাক্সটার ওপরে খেরো খাতা লিখছিলেন মিত্তির মশাই। হাটবারেই যা দু'এক খানা চেক কাটা যায়। তবুও আদায়ের অবস্থা এবারে অত্যন্ত মন্দা। প্রজাদের তো কথাই নেই—বড় বড় মহাজনরা পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। চারদিকেই যেন অলক্ষ্মীর অশুভ নিশ্বাস অনুভব করা যায়।

তেলের কলটা একবার বসলে কিছু রক্ষা হয় তবু। আর ওই অবিদ্যেপাড়া! কম করে এখনো তো পঁচিশ ত্রিশ ঘর হবেই। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে চেষ্টা করে দেখতে হবে একটা আলাদা ট্যাক্স বসিয়ে ওদের উঠিয়ে দেওয়া চলে কিনা।

—পেন্নাম হই বাবু!

চমকে শ্রীধর মিত্তির দেখলেন এক পা ধুলো নিয়ে সদরের পেয়াদা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অ্যাঁ দাশু যে। তারপর খবর কী?

দাশু একগাল হাসলে। বললে, খবর কিছু আছে বই কি। এবার লাটের কিস্তী আদায়ে স্বয়ং নতুন ম্যানেজার আসছেন যে। কালতক এখানে পায়ের ধুলো দেবেন, কাগজ পত্তর যেন সব ঠিক থাকে।

—নতুন ম্যানেজার,—মানে মদনবাবু আসবেন ? সে কি হে !

—আজ্ঞে সেই খবরই তো দিতে এলুম। আইনটাইন মিলে তিন চারটে পাশ করা মানুষ, একটু সাবধান হয়ে থাকবেন আর কি।

মিত্তির মশাই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই নতুনের দলকে ভয় করেন তিনি। এদের সর্বাঙ্গ ঘিরে একটা বিচিত্র ঔদ্ধত্য তীব্র দ্যুতিতে ঝকমক করে। সব সময় সেটাকে চোখে দেখা যায় না—কিন্তু বিদ্ধ করতে থাকে। তা ছাড়া এই নতুন ম্যানেজারের মেজাজ সম্পর্কেও নানারকম জনশ্রুতি কানে এসেছে। যত রকমের মন্ত্র-মন্ত্রণা, সব কিছু প্রয়োগ করেও তাঁর আমলা—কর্মচারীর দল তাঁকে খুশি করবার কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারেনি।

একটা অপরিসীম দুশ্চিন্তায় মিত্তির মশাইয়ের সারা রাত ঘুম এল না। এই ভাঙা বন্দরে আজ আর মানুষ নেই। নিতান্তই যাদের ছেঁড়া শিকড় কোন রকমে জড়িয়ে রয়েছে, তারাই দায়ে পড়ে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে এখনো। কিন্তু দিন তাদেরও শেষ হয়ে এল। বারোয়ারীতলায় মালতীর কীর্তন সুরু হয়েছে : যেটুকু বাকী আছে তাও একদিন নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে যাবে সুনন্দার জলে। দেড়শো ডে-লাইটের সঙ্গে সঙ্গে চীনে-বাজারটা যেমনভাবে লোপ পেয়েছে—তেমনি ভাবে।

কিন্তু আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে এই বন্দরও আধুনিক ছিল। নতুন ম্যানেজার মদনবাবু পঁচিশ বছর আগে এলেই ভালো করতেন। আজকের এই স্তূপাকার শূন্যতা তাঁকে খুশি করবে কী দিয়ে ?

তব শেষ পর্যন্ত মদনবাব ভাঙা বন্দরে এসেই পা দিলেন।

সারা সকাল হারাণের স্টল থেকে একবারটি ঘুরে আসবারও সময় পেলেন না মিত্তির মশাই। রাশীকৃত কাগজ আর হিসাবপত্তর নিয়ে তাঁকে বেলা বারোটা পর্যন্ত তটস্থ ভাবে কাটাতে হল ম্যানেজারের সঙ্গে। দুপুরবেলা কাছারীর বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে ম্যানেজার বললেন, বড্ড নোংরা জায়গাটা আপনাদের। এখানে আধঘণ্টা থাকলে মানুষের যেন দমবন্ধ হয়ে আসে মশাই।

শ্রীধর মিত্তির যেন ঘা খেলেন একটা। এ কথাটা শোনবার জন্যে যেন তিনি প্রস্তুত ছিলেন না মনের দিক থেকে। আজ দুর্দিন এসেছে বলে চিরটাকালই কি এরকম ছিল? লোকে বলত—এই বন্দর যেন ছবির মতো সাজানো। ঝকঝকে তকতকে—মানুষে এখানে হাওয়া বদলাতে আসত। তিন মাস এখানে থাকলে যক্ষা সেরে যেত, আর আজ—

শ্রীধর মিত্তিরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: বলেন কি স্যার, নোংরা! আজ এর অবস্থা এমন হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু পঁচিশ বছর আগে……

পঁচিশ বছর আগেকার গল্প বলতে লাগলেন তিনি। এই মুহূর্তে যেন আধুনিক কালটা দৃষ্টির আড়াল সরিয়ে সামনে থেকে মিলিয়ে গেছে কালো একটা পর্দার মতো। বর্তমান আর সত্য নেই। সুনন্দার সমস্ত দক্ষিণপাড়াটা জুড়ে কুণ্ডুদের প্রকাণ্ড লবণের গোলা। চীনে-বাজারের নিচে দশ-বারোখানা ডেসপ্যাচ স্টিমার নোঙর করে রয়েছে। কাটা ঘুড়ির মতো রাশিরাশি কারেন্সি নোট বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে—আকাশ থেকে ফুলঝুরির মতো ফুটে পড়ছে টাকার ফুলকি।…

মিত্তির মশাইয়ের গলা কাঁপতে লাগল। উত্তেজনায়—আনন্দে। মনের অজ্ঞাত প্রান্ত থেকে ভেসে এসেছে একটা দুঃসহ প্রেরণা। অনুভূতির সমস্ত তন্ত্রীগুলোর ওপর দিয়ে সে সমস্ত দিন যেন মীড়ের মতো

রণিত হয়ে উঠছে। কালীমোহন সাহার গদীতে সেই ত্রিনাথের পাঁচালি। বাংলাদেশে কোথাও এমন হয়নি, কোথাও এমন হবে না—হতে আর পারেও না।

বলা শেষ হয়ে গেল, তবু সেই বলার ঝঙ্কারটা এখনো যেন স্নায়ুগুলোর ওপর ক্রিয়া করছে। তাঁর চোখে জল এল।

কিন্তু মদনবাবু হাসলেন। সে হাসিতে কৌতূহল নেই—সহানুভূতি নেই। আধুনিকেরা কৌতূহলী হতে চায় না। স্পর্ধার একটা তীক্ষ্ণাগ্র ছুরি দিয়ে অতীতের সব কিছুকেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়।

নিতান্ত সাধারণ, অনাসক্ত ভাবে হেসে মদনবাবু বললেন, তা হবে।

শ্রীধর মিত্তিরের সমস্ত মনটা যেন চীৎকার করে প্রতিবাদ করবার জন্যে উদ্যত হয়ে উঠেছে। এই নিঃশব্দ অবজ্ঞাটা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করতে লাগল। অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংযত করলেন তিনি।

—বিকেলে একবার দয়া করে বেরোবেন স্যার। দেখবেন কী ছিল এখানে। মানুষ নেই বটে, কিন্তু জঙ্গলের মাঝখানে এখনো পড়ে রয়েছে সব [illegible] মতো বাড়ি। বারোয়ারীতলার আখড়াবাড়িতে রথযাত্রার সময় দু'হাজার লোক প্রসাদ পেত, [illegible] সব—

মদনবাবু হাই তুললেন। আলস্যজড়িত স্বরে বললেন, যাই বলুন, তিনটে দিনও এখানে কাটানো আমার পক্ষে কঠিন হবে। একেবারে আড়ষ্ট বদ্ধ-জীবন। লাটের টাকাটার ব্যবস্থা করতেই দায়ে পড়ে আসা একরকম। আপনারা একটু চেপে আদায়-তশিল করলে এ দুর্ভোগ আমাকে বইতে হত না।

মিত্তির মশাই অধৈর্য হয়ে উঠলেন। এ উদাসীনতা সহ্য হয় না। বর্তমানের ঝাঁঝালো উগ্রতা ছাড়া আধুনিকদের বিশ্বাস করানো অসম্ভব।

অতীতের পটভূমিটাকে অস্বীকার করতে পারলেই যেন তারা সান্ত্বনা পায়।

—একটা তেলের কল বসবে স্যার। মস্ত কল। বিরানব্বুই খানা ঘানি। আসছে অঘ্রাণ মাসে এসে দেখবেন এখানকার চেহারা বদলে গেছে। লোকজনের কিছু আমদানী হলেই এই ভাঙা বন্দরের শ্রী ফিরে যাবে। তখন বলবেন—

—ওঃ! মদনবাবু একটা সিগারেট ধরালেন।

অসহ্য, ভাষাতীত অপমানের বেদনায় শ্রীধর মিত্তিরের যেন কান্না আসতে লাগল। এই বন্দর! পঁচিশ বছর আগে যারা এখানে আসেনি, তারাই কেবল একে অস্বীকার করতে পারে। কালের অবরুদ্ধ ঝাঁপিটা একবার খুলে দিয়ে আধুনিকদের চোখে সেদিনকার মণি-মুক্তোর ঝলস দেখিয়ে কে ধাঁধা লাগিয়ে দিতে পারে? কোন্ যাদুকরের হাতে বন-মানুষের হাড় ভেল্‌কি দেখিয়ে সে অসম্ভবটাকে সম্ভব করে তুলতে পারে? কালস্রোতে যা বিস্মৃতির দিগন্ত-সমুদ্রে লীন হয়ে গেছে, কোন্ যাদুমন্ত্রে এতগুলো বছরের মৃত-কঙ্কাল মাড়িয়ে তা আবার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে?

সমগ্র মানসিকতায় যেন তাঁর বিশৃঙ্খলার দোলা লাগল। এই মুহূর্তে, —একটা অস্বাভাবিক, অপরিচিত উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি যেন নিজেকে অতিক্রম করে গেলেন। তাঁর সমস্ত সংস্কার, আজন্মলালিত সমস্ত বিশ্বাস যেন মদনবাবুর অনাসক্ত হাসির পেছনে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে এল মিলিয়ে।

কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল তাঁর। কপালের শিরাগুলো দপদপ করতে লাগল অত্যধিক রক্তের চাপে। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে হৃৎপিণ্ডটা ঘা মারতে লাগল পাঁজরের ওপর।

সমস্ত শক্তিকে কণ্ঠে একত্র করে এনে মিত্তির মশাই বললেন, সময় কাটাবার ভালো ব্যবস্থা এখানেও আছে স্যার। কিছু যদি মনে না করেন—

মদনবাবু চোখ দুটোকে কুঁচকে প্যাঁচার মতো ছোটো করে আনলেন। বললেন, না না, মনে করব কেন! স্বচ্ছন্দে বলুন না আপনি

শুকনো ঠোঁট দুটোকে শ্রীধর মিত্তির একবার চাটলেন জিভ দিয়ে। জীবনের সব চাইতে বড় অসত্য, সব চাইতে কুৎসিত কথাটা আজ উচ্চারণ করতে হবে তাঁকে। অধঃপতনের মাত্রা যে কোন স্তরে পৌঁচেছে তা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু অতীত আর বর্তমানের দ্বন্দ্বে জয়লাভ করতেই হবে অতীতকে। আর এই জয়ের মূল্য দিতে তাঁর এত দিনকার যা কিছু প্রতিষ্ঠা, যা কিছু শুভবুদ্ধি, সব কিছুকেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে হাতের পাশার মতো :

—যদি, যদি কিছু মনে না করেন স্যার। এখানে মালতী বলে একটা মেয়েমানুষ আছে। যেমন চেহারা, গানবাজনাতেও তেমনি।—একটা ঢোক গিলে মিত্তির মশাই বললেন, যদি ইচ্ছে করেন, তা হলে—

মদনবাবুর মুখের ওপর দিয়ে শাণিত তলোয়ারের মতো আধুনিকতার একটা বাঁকা হাসি ঝকঝক করে গেল। একটা চাবুকের আঘাত খেয়ে চমকে উঠলেন মিত্তির মশাই।

মদনবাবুর কথার মধ্যে উত্তাপ নেই। অস্বাভাবিক প্রশান্তস্বরে আধুনিকেরা অদ্ভুত রকমের নিষ্ঠুর কথা বলতে পারে। ভেতরকার বহ্নি-কুণ্ডটা চোখে দেখা যায় না—কিন্তু তার নির্নিরীক্ষ্য তাপে সমস্ত শরীর যেন ঝলসে দেয়।

—মাপ করবেন মিত্তির মশাই। ওতে আমার রুচি নেই। আপনার সম্পর্কে যা শুনেছিলুম তাতে তো আপনাকে অন্য রকমের বলেই জানতুম।

যাক, বুড়ো হয়েছেন—এখন ওসব ছেড়ে দিন। পরকাল বলে আছে তো একটা, কী বলেন?

হৃৎপিণ্ডটা যেন বুকের ভেতর একখণ্ড পাথরের মতো ভারী আর জমাট হয়ে গেছে। কপালের শিরাগুলো দিয়ে যেন তিরতির করে সমস্ত শরীরের ভেতর একটা বরফের স্রোত নেমে গেল। ত্রেতাযুগ আর নেই, তাই এত বড় লজ্জা আর অপমানের পরেও পৃথিবীর মাটিতে এতটুকু চিড় ধরল না। শুধু খেরো খাতার অক্ষরগুলো জীবন্ত হয়ে উঠে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকার মতো মিত্তির মশায়ের চার পাশে ছিটকে পড়তে লাগল।

সন্ধ্যার সময় চায়ের স্টলে একটা বিড়ি এগিয়ে দিতে দিতে হারাণ বললে, আর শুনেছেন তেলের কলটা যে ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে।

যান্ত্রিকভাবে মিত্তির মশাই বললেন, কেন?

—যুদ্ধের যে রকম বাজার, সাহস পাচ্ছে না কোম্পানী। শুনেছি লোহালক্কড়গুলো সব বিক্রী করে দেবে।

—ওঃ।—নিতান্ত সংক্ষেপে, নিতান্ত নির্বিকারভাবে মিত্তির মশাই এটুকু উচ্চারণ করলেন। আশ্চর্য, মদনবাবুর সঙ্গে তাঁর উচ্চারণ-ভঙ্গির যেন এতটুকু তফাৎ নেই। অনাসক্তির একটা স্তরে এসে দু'জনেই এক হয়ে গেছেন।······

······সামনে সুনন্দার বুকে কালো অন্ধকার। ভাঙা বন্দরের খাড়া পাড়ের গায়ে জোয়ারের স্রোত আঘাত করে চলেছে। কোথায় সেই মগবাজার, সেই চীনেবাজার, সেই জমজমাট সাহাপট্টি। কালিজিরার নদীর মুখে কিছুদিন থেকে যে মস্ত চড়াটা জেগে ওঠবার উপক্রম করছে, তার সঙ্গে হয় তো সে ইতিহাসের কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে। সুনন্দার জলে জেলে-নৌকার অসংখ্য আলো, কিন্তু সে আলোগুলোর রঙ অতিমাত্রায়

জ্বালচে। কালামোহন সাহার প্রকাণ্ড শরীরটার ওপর ছিটকে পড়া যে একরাশ রক্ত।......

লজ্জা অপমানের কিছু আর বাকী নেই আজকে। চরম মিথ্যার কাছে পরম অসত্যের কাছে আত্মবিক্রয় করে মিত্তির মশাই বর্তমানকে জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাশা উল্‌টে পড়েছে।

ভাঙা বন্দর কোনোদিন আর জোড়া লাগবে না।

যাক, বুড়ো হয়েছেন—এখন ওসব ছেড়ে দিন। পরকাল বলে আছে তো একটা, কী বলেন?

হৃৎপিণ্ডটা যেন বুকের ভেতর একখণ্ড পাথরের মতো ভারী আর জমাট হয়ে গেছে। কপালের শিরাগুলো দিয়ে যেন তিরতির করে সমস্ত শরীরের ভেতর একটা বরফের স্রোত নেমে গেল। ত্রেতাযুগ আর নেই, তাই এত বড় লজ্জা আর অপমানের পরেও পৃথিবীর মাটিতে এতটুকু চিড় ধরল না। শুধু খেরো খাতার অক্ষরগুলো জীবন্ত হয়ে উঠে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকার মতো মিত্তির মশায়ের চার পাশে ছিটকে পড়তে লাগল।

সন্ধ্যার সময় চায়ের স্টলে একটা বিড়ি এগিয়ে দিতে দিতে হারাণ বললে, আর শুনেছেন তেলের কলটা যে ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে।

যান্ত্রিকভাবে মিত্তির মশাই বললেন, কেন?

—যুদ্ধের যে রকম বাজার, সাহস পাচ্ছে না কোম্পানী। শুনেছি লোহালক্কড়গুলো সব বিক্রী করে দেবে।

—ওঃ।—নিতান্ত সংক্ষেপে, নিতান্ত নির্বিকারভাবে মিত্তির মশাই এটুকু উচ্চারণ করলেন। আশ্চর্য, মদনবাবুর সঙ্গে তাঁর উচ্চারণ-ভঙ্গির যেন এতটুকু তফাৎ নেই। অনাসক্তির একটা স্তরে এসে দু'জনেই এক হয়ে গেছেন।......

......সামনে সুনন্দার বুকে কালো অন্ধকার। ভাঙা বন্দরের খাড়া পাড়ের গায়ে জোয়ারের স্রোত আঘাত করে চলেছে। কোথায় সেই মগবাজার, সেই চীনেবাজার, সেই জমজমাট সাহাপট্টি। কালিজিরার নদীর মুখে কিছুদিন থেকে যে মস্ত চড়াটা জেগে ওঠবার উপক্রম করছে, তার সঙ্গে হয় তো সে ইতিহাসের কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে। সুনন্দার জলে জেলে-নৌকার অসংখ্য আলো, কিন্তু সে আলোগুলোর রঙ অতিমাত্রায়

লালচে। কালামোহন সাহার প্রকাণ্ড শরীরটার ওপর ছিটকে পড়া যেন একরাশ রক্ত।……

লজ্জা অপমানের কিছু আর বাকী নেই আজকে। চরম মিথ্যার কাছে, পরম অসত্যের কাছে আত্মবিক্রয় করে মিত্তির মশাই বর্তমানকে জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাশা উল্‌টে পড়েছে।

ভাঙা বন্দর কোনোদিন আর জোড়া লাগবে না।

কবর

চমৎকার গাড়িটা। যেন প্রজাপতির মতো পাখা মেলে উড়ছে। পি. ডব্‌লু. ডি-র পীচ ঢালা মসৃণ রাস্তা—এক একটা কালভার্টের কাছে এসে যেন উটের মতো উঁচু হয়ে উঠছে আবার নেমে যাচ্ছে তরঙ্গের মতো। শাদার ওপরে কালো কালো ডোরাকাটা মাইল পোষ্টগুলো যেন হাত ধরাধরি করে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে পেছনে। পুরু স্প্রীংয়ের গদিতে মৃদুমন্দ দোলা লাগছে, শরীরের মধ্যে শিরশির করে উঠছে গতির একটা বিচিত্র শিহরণ;

ড্রাইভ করছে শা-নওয়াজ নিজেই। আমি ওর পাশে বসে আছি। ওর চোখে কালো গগ্‌লস্, আমি সে দুটো দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি কী গভীর গৌরবে আর চরিতার্থতায় সে দুটো ঝকঝক করে উঠছে। এই যুদ্ধের বাজারেও পাঁচগুণ দাম দিয়ে এবং বহু সন্ধান করে নতুন গাড়ি কিনেছে শা-নওয়াজ। পেট্রোল কোথা থেকে যোগাড় করেছে কে জানে, কিন্তু আমাকে নিয়ে পি. ডব্‌লু. ডি-র রাস্তায় লম্বা রাইড দিচ্ছে সে।

বেলা বেড়ে উঠেছে, সকালের রোদে উদ্ভাসিত হয়েছে প্রকাণ্ড রাস্তা। অ্যাকসিলেটারে চাপ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির স্পীড বাড়ছে ক্রমাগত। পথটা যেন মহাকায় সরীসৃপের মতো ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকিয়ে মোটরের তলায় এসে ঢুকছে, কালভার্ট, মাইলপোষ্ট, টেলিগ্রামের তার আর বনজঙ্গল

—সব কিছুই যেন পিছিয়ে যাওয়ার একটা দীর্ঘ-শৃঙ্খলে বাঁধা। সমস্ত শিরা-স্নায়ুগুলোকে শিথিল করে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দটা দেহে মনে অনুভব করছি।

—গাড়িটা কেমন রঞ্জন ?

এ প্রশ্ন শা-নওয়াজ আমাকে আরো অনেকবার করেছে এবং আমিও উচ্ছ্বসিত ভাষায় তার জবাব দিয়েছি। তাই এবারেও সংক্ষেপেই বললাম, মার্ভেলাস !

—সত্যিই মার্ভেলাস ! একেবারে নীট, টিপটপ। নাইন্টিন ফর্‌টিফোর মডেল। অনেক ঘুরে কেনা, বাজে হওয়ার মতো জিনিসই নয়।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

—আমার কতদিনের স্বপ্ন !—শা-নওয়াজের গলা গভীর হয়ে এল : পাশ দিয়ে যখন বড়লোকের মোটর ছুটে বেরিয়ে গেছে, ধুলোয় অন্ধ হয়ে চোখে কাপড় দিয়ে ভেবেছি, দিন আমার কখনো কি আসবে না ? নিজেকে এত ছোট লেগেছে, [illegible] অপমানিত বোধ হয়েছে !

—তাই যুদ্ধের বাজারে গাড়ি কিনে বুঝি সে অপমানের প্রতিশোধ নিলে ?

—নিশ্চয়—অনেকটা যেন অপত্যস্নেহে অভিভূত হয়েই শা-নওয়াজ ষ্টিয়ারিঙের গায়ে হাত বুলোতে লাগল : এ আমার স্বপ্নের বাস্তব রূপ। সত্যি বলতে কি ভাই, গাড়িটার আমি প্রেমে পড়ে গেছি।

—তাই বলে অ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটিয়ো না এখন।

আমি সাবধান করে দিলাম। বোঁ-ও-ও—নক্ষত্রবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল আমাদের গাড়িটা। একটুর জন্যে চাপা পড়েনি একটা নেড়ী কুকুর।

—নন্‌সেন্স,—মুখ বাঁকিয়ে শা-নওয়াজ বললে, নন্‌সেন্স ! কী হয়

একটা কুকুর চাপা পড়লে? মোটর চিরকালই চলবে এবং যারা চাপা পড়বার চিরদিনই চাপা পড়বে তারা। সি. এস. পি. সি. এ কিংবা ওই সব প্রাণী-হিতৈষণায় আমার কোনোরকম সহানুভূতি নেই। মানুষের সমস্যার সমাধানই যেখানে হচ্ছে না, সেখানে ইতর জীবের জীবন-মরণ নিয়ে ভাবতে যাওয়া pure and simple idiocy!

আমি ব্যথিত হয়ে উঠলাম: তাই বলে শুধু শুধু কুকুরটাকে চাপা দেবে নাকি?

—ধ্যাৎ।—ষ্টিয়ারিঙের ওপর শা-নওয়াজের আঙুলগুলো শক্ত হয়ে আঁকড়ে পড়ল: তোমার রোমান্টিসিজ্‌ম বড্ড বেশি অ্যানিম্যাল-ধর্মী, রঞ্জন। পঞ্চাশ লাখ মানুষের মরণ সয়ে গেলে নির্বিবাদে, আর একটা কুকুরের কথা ভুলতে পারছ না?

বিরক্ত হয়ে বললাম, কী করতে বলো তুমি?

—কিছুই করতে বলিনা—কথাটার মাঝখানে হঠাৎ যেন একটা থাবা দিয়ে সব কিছুকে থামিয়ে দিলে শা-নওয়াজ। গগল্‌সের আড়ালে ওর চোখ দুটো অদৃশ্য, কিন্তু মুখের ওপর একটা কঠিনতার নির্মম রেখা আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। এটা ওর চরিত্রের সত্যিকারের বৈশিষ্ট্য। যেমন দৃঢ়ব্রত, তেমনি নিষ্ঠুর। সি-পি-র জঙ্গলে গিয়ে তাঁবু গেড়ে মিলিটারী কণ্ট্রাক্টের বাঁশ কেটেছে, বাঘের ভয়ে চারদিকে মশাল জেলে দিয়ে রাত কাটিয়েছে; আসামের আরণ্য-দুর্গমতায় পাগ্‌লা হাতীর উপদ্রবের মধ্যেও কাঠ ভাসিয়েছে ডিহাং নদীর জলে। যুদ্ধের বাজারে না নিয়েছে এমন কণ্ট্রাক্ট নেই। জীবনের সংকল্পে নির্ভীক এবং একনিষ্ঠ।

বিপরীত-ধর্মী মানুষের পরস্পরের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে—অনেকটা বৈদ্যুতিক নিয়মে। তাই আমার মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন

জগতের বাসিন্দা এবং একান্তভাবে ঘরকুনো অতি সাধারণের সঙ্গে বন্ধুতা হয়েছে ওর। ওর নানা অভিজ্ঞতা থেকে গল্প লেখার প্লট পাই আমি। তা ছাড়া নতুন কোনো কন্ট্রাক্টের টাকা পেলেই ও পেট ভরে বিলিতী খাবার খাইয়ে দেয় আমাকে। সুতরাং শা-নওয়াজকে আমি ভালোবাসি।

মোটর চলেছে। বাইরের গতিহীন পৃথিবী ছায়াছবি হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। নিচে আলোর রাস্তায় একটা বাছুর প্রাণপণে ছুটছে মোটরের সঙ্গে, হয়তো পাল্লা দিচ্ছে, অথবা এই ভয়ানক জন্তুটার হাত থেকে কোন পথে পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে তারই দিশে পাচ্ছে না হয়তো। দু'দিকে ধানের ক্ষেতে বয়ে যাচ্ছে সবুজের জোয়ার, চকচক করে উঠছে বিল, কখনো বা এক একটা পদ্মবন। কাদা মেখে দুটো মহিষ বিলের মধ্য থেকে মাথা তুলেছিল, কিছু একটা বিপদ আশঙ্কা করে আবার চট করে মাথা নামিয়ে নিলে তারা। পি. ডব্লু ডি-র রাস্তাটা একটা কালো ফিতের মতো গুটিয়ে আসছে ক্রমাগত।

সামনের কাঁচটা কাঁপছে, তার ওপরে এক পর্দা ধুলো। শা-নওয়াজের গগ্‌লসের ওপরেও লাল ধুলোর হালকা আবরণ পড়েছে একটা। রুমালে গগ্‌লস্‌টা মুছে নিয়ে ও তাকালো আমার দিকে।

—কী ভাবছ?

—কিছুই না—বাইরের দিকে চোখ রেখে আমি জবাব দিলাম।

শা-নওয়াজ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। একটা মোষেরগাড়িকে সচেতন করে দেবার জন্যে হর্ণ বাজালে বারকতক। তারপরে আবার ফিরে তাকালো।

—পঞ্চাশ লাখ লোক মরে গেল। ভালোই হল। বেশি লোক থাকলেই অসুবিধে, সবাই পথ চলতে চায়, অনাবশ্যক ভিড় করে রাস্তায়।

তার চাইতে ভিড়টা বরং কিছু পাতলা হওয়া দরকার, মোটর চালানো যায় আরামে।

—তোমার ফিলসফিটা ঠিক ধরতে পারছি না—বেশি সিনিক্যাল্ ঠেকছে।

ও একটু হাসল। কঠিন মুখের রেখাগুলো কেমন বিচিত্র আর কোমল হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে।—সিনিসিজ্ম নয়। এটা জীবন দর্শন।

—তার মানে?

ভোঁপ—ভোঁপ। একটি সাঁওতাল-দম্পতি। পুরুষটির কাঁধে মাদল, মেয়েটির খোঁপায় শিরীষ ফুল আর একরাশ সবুজ পল্লব, কষ্টিপাথরে তৈরি দুটো কালো মূর্তি সুঠাম, সুছাঁদ। বিভোর হয়ে পথ চলেছে দু'জনে, হয়তো প্রথম-প্রেম, হয়তো সদ্যো বিবাহিত। তাই বাইরের জগৎ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন নয়। কিন্তু আর একটু হলেই দু'জনকে এক সঙ্গে সহমরণে যেতে হত।

—ইডিয়ট্স। চাপা পড়ত এক্ষুনি।

আমি হাসলাম: ওরা এখন আলাদা মানুষ। নিজেদের বাইরে পৃথিবীর কোনো জিনিসই ওদের চোখে পড়ছে না।

—তাই বলে পৃথিবী ওদের ক্ষমা করবে না কোনোদিন। একচক্ষু হরিণের মৃত্যু হয়েছিল এমনি করেই—শা-নওয়াজ কথাটা যেন ছুঁড়ে মারল আমার মুখের ওপর।

ভারী আশ্চর্য লাগছে আমার। এতদিন ওকে শুধু লাভ-ক্ষতির হিসেব করতেই শুনেছি; ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে দেখেছি বড়বাজারে, ড্যালহাউসি স্কোয়ারে, শেয়ালদা আর হাওড়া ষ্টেশানে, মিলিটারীদের হেড্ কোয়ার্টারে। কিন্তু এই ঝকঝকে দামী নতুন মোটরে, জনবিরল

গ্রামের পথ দিয়ে চলতে চলতে ও যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছে। অথবা এই ধানক্ষেত আর বিস্তীর্ণ গ্রামের প্রান্তরের মধ্যে এসে সত্যিকারের মানুষটারই পরিচয় পাচ্ছি হয়তো।

বললাম, আজ তোমার হয়েছে কী?

মুখের রেখাগুলো আবার কঠিন হয়ে উঠেছে ওর। অ্যাক্সিলেটারে চাপ পড়ছে আবার। খুব আস্তে আস্তে কথা বললে ও। বাতাসে শব্দের অনেকটা উড়িয়ে নিয়ে গেল, তবুও আমি শুনতে পেলাম: নিজের কথাই ভাবছি।

—নিজের?

—হাঁ, নিজের বই কি। কম দুঃখে মানুষ হইনি ভাই। ছেলেবেলায় বাপ মরে গেল। বড়লোকের ঘরে জন্মাই নি, মা করত মোড়লের বাড়িতে বাঁদীর কাজ। পানের থেকে চুন খসলে মোড়লের ছোট বিবি মাকে লাথি মারত; সেই লাথির ফলে বেচারার সামনের দুটো দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। মরবার সময় পর্যন্ত সে চিহ্ন মা সগৌরবে বহন করেছে।

—সে কথা এখন ভুলে যাও—আমি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম: তুমি তো মানুষ হয়েছ আজকে।

—মানুষ? তা হবে। ওর মুখে আবার এক টুকরো হাসি রেখায়িত হয়ে উঠল: আইন-সঙ্গতভাবে—কথাটার ওপরে জোর দিয়ে শা-নওয়াজ বললে, আইন-সঙ্গতভাবে মানুষ হয়ে উঠতে গেলে যা যা দরকার, তার কিছুকিছু আমার ছিল বই কি। লেখাপড়ায় খারাপ ছিলাম না। মাইনারে বৃত্তি পেয়েছিলাম ডিভিশনে ফার্ষ্ট হয়ে, ম্যাট্রিক পর্যন্ত চালিয়ে ছিলামও মন্দ নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাট্রিকটা আর পাশ করতে পারলাম না।

—কেন পারলে না?

—কী করে পারব। পড়ছিলাম অবশ্যি খেটেখুটেই, মাষ্টাররাও অনেক আশা করতেন আমার ওপর। পরীক্ষার তখন আর দিন পনেরো বাকী। খুব মন দিয়ে অ্যাল্‌জাব্রার অঙ্ক কষছি। হঠাৎ মা-র হাঁউমাউ কান্না শুনে বাইরে ছুটে এলাম।

শা-নওয়াজ একটু একপেশে করে নিলে গাড়িটা—কীপ্ টু ইয়োর লেফ্‌ট্। উলটো দিক থেকে বেরিয়ে গেল বিরাট মূর্তি মিলিটারী ট্রাক। খালি গায়ে অসংখ্য উল্‌কি-আঁকা দু'জন আমেরিকান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। আমাদের ঝকঝকে নতুন গাড়িটার ওপর কিছুটা যেন ঈর্ষার দৃষ্টি ফেলে গেল।

—বাইরে বেরিয়ে দেখি—ও আবার সুরু করলে: মা উঠোনে দাঁড়িয়ে। সারা গায়ে মারের দাগ, কোথাও ফুলে উঠেছে, কোথাও কেটে বসেছে। ময়লা ফতাটা রক্তে রাঙা। ব্যাপারটা শুনলাম। মোড়লের বড় ছেলে এসেছে শহর থেকে, তারই জামার পকেট থেকে চুরি গেছে দু'খানা দশ টাকার নোট। বাড়িতে অবশ্য বাজে লোকের অভাব ছিল না, কিন্তু যে সব চাইতে নিরীহ আর অসহায় তাকেই তো অপরাধী করা সব চাইতে সহজ। তাই মোড়লের ছোট বিবি, বড় আদরের নিকার বিবি সন্দেহ করেছে, এ মার-ই কাজ। অস্বীকার করাতেও চোরের মারটা বাদ যায়নি। অথচ মা-র সম্বন্ধে এ অপবাদ দেওয়া যে কতটা মিথ্যে তা ওরা নিজেরাও কিছু কম জানত না। কিন্তু—শা-নওয়াজ বিকৃতভাবে হাসল: অন্যায় হয়ে গেলে কাউকে তো শাস্তি দিতেই হবে ভাই। হবুচন্দ্র রাজার বিচার এই কথাই বলে। চুরি করতে গিয়ে চোর যদি দেয়াল চাপা পড়ে মরে তা হলে কুমোরকে ধরে ফাঁসি দাও। আইনের মর্যাদা তো রাখতে হবে।

—কী ভয়ানক অন্যায়! আমি অভিভূত হয়ে বললাম।

—না, না, অন্যায় নয়। শা-নওয়াজের মুখে হাসিটা তেমনি করেই লেগে রইল: এইটেই তো আইন। কিন্তু তখন প্রথম যৌবন, রক্ত গরম, আইন-কানুনের এত সব খুঁটিনাটি ব্যাপার কি আর জানতাম। আমার মাথার মধ্যে দপ করে আগুন জ্বলে গেল। হাতের কাছ থেকে কী একটা কুড়িয়ে নিয়েছিলাম ঠিক মনে নেই, হয়তো লাঠি, হয়তো আস্তো একটা বাঁশের টুকরো। মা চীৎকার করে কেঁদে আমাকে নিষেধ করলে, কিন্তু আমি শুনতে পেলাম না। ছুটে বেরিয়ে গেলাম মোড়লের বাড়ির উদ্দেশ্যে। পড়বি তো পড়—সামনেই মোড়লের বড় ছেলে। হাতে হুইল, মুখে সিগারেট, পুকুরে মাছ ধরতে চলেছে। কী একটা জিজ্ঞেস করলাম, উত্তর পেলাম কদর্য আর কটুভাষায়। 'বাঁদীর বাচ্চা', কথাটা কানে ঢোকবামাত্র আমার আর হিতাহিত জ্ঞান রইল না। হাতের বাঁশটা চলতে লাগল নির্বিচারে। যখন খেয়াল হল, তখন তাকিয়ে দেখি মোড়লের বড় ছেলে মাটিতে পড়ে আছে নিঃসাড় হয়ে, মাটি ভিজে গেছে রক্তে।

আমি শিউরে উঠলাম: খুন করে ফেললে?

শা-নওয়াজ এবারে শব্দ করে হেসে উঠল: পারলাম কই। ইচ্ছে তাই ছিল বটে, কিন্তু বড়লোকের জান কড়া, অত সহজে ওরা মরে না। ঠিক সেরে উঠল।

—আর তুমি?

—আমি? বুঝতে পারছ না এখনো?—শা-নওয়াজ একবার বাইরের দিকে তাকালো। কালো পীচের পথ ছলেছলে অদৃশ্য হচ্ছে। দু'পাশে শৃঙ্খলিত মাইল-পোস্টগুলোর অভিযান। বাঁশের বনে বাতাস ঢেউ দিয়ে যাচ্ছে।

—মোড়ল ছিল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। থানার দারোগা মাসে পনেরো দিন তার বাড়িতে পোলাও খেত। আমি সদরে চালান হয়ে

গেলাম। হাকিম ছিলেন দয়ালু—সাক্ষাৎ ড্যানিয়েল। সবটা শুনে মাত্র তিনমাস জেল দিলেন আমার।

—তিনমাস! জেল খাটলে?

—খাটলাম বই কি।—গগ্‌লসের ভেতরে শা-নওয়াজের চোখ জ্বলছে, বাইরে থেকেও আমি তা টের পেলাম। সে বলতে লাগল: জেলখানা না দেখলে মানুষ গড়বার এমন সার্থক যন্ত্রটির পরিচয় অজানাই থেকে যেত। পাথর ভাঙলাম, বুটের লাথি খেলাম, সরকারকে সেলাম দিয়ে রাজভক্তি শিখলাম। তিন মাস ধরে সরকারের সযত্ন পরিচর্যায় একেবারে বিশুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এলাম আগুনে-পোড়া খাঁটি সোনা যাকে বলে। তখন আমার চরিত্রের উৎকর্ষতা দেখলে দেবতাদেরও হিংসে হত। ম্যাট্রিক তো ওই পর্যন্তই, বেরিয়ে দেখি মা-ও মরে বেঁচেছে।

আমি চুপ করে রইলাম। মনে হল, কুকুর চাপা দেবার অধিকার শা-নওয়াজের নিশ্চয়ই আছে।

—তারপর গ্রাম ছাড়লাম। কী জন্যে আর গ্রামে থাকব? সামনে এসে দাঁড়ালো প্রকাণ্ড পৃথিবী, ডেকে বললে, আমাকে জয় করে নাও। এসে ভিড়লাম উত্তরপাড়ার এক চটকলে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলাম, চাকরী টিঁকল না। মালিক জেলে পাঠাবার উপক্রম করলে। সরকারী রিফাইনারীর সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা করবার ইচ্ছে ছিল না, সটকে পড়লাম। চিৎপুরের হোটেলে খাতা লিখলাম, ক্যানিং ষ্ট্রীটে মনোহারীর দোকান দিলাম, কত কী করলাম, কিন্তু কোনোটাই পোষাল না। জীবনের মূলমন্ত্র তখনো জানিনি কি না।

—তারপরে জানলে?—আমি অন্যমনস্কের মতো জিজ্ঞাসা করলাম।

—জানলাম বই কি—হঠাৎ অ্যাক্সিলেটারে আবার চাপ পড়ল। গাড়িটার স্পীড বাড়ছে ক্রমাগত, ট্রাফিক পুলিশ থাকলে এতক্ষণে আইনের

আওতায় আসতাম আমরা।—তার ফলেই এই গাড়ি। অনেক ঠেকে-শেখা, অনেক অভিজ্ঞতার পরে এই পুরস্কার। তাইতো গাড়িটাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

শা-নওয়াজ পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেট ধরালে আর একটা বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে। দু'জনে নীরবে সিগারেট টানতে লাগলাম। মোটরের চাকার তলায় পথটা আছড়ে পড়তে লাগল ক্রমাগত।

নিঃশব্দ কয়েকটা মুহূর্ত। শুধু গাড়ির চাকার গতির ছন্দ। স্প্রীংয়ের গদিতে মৃদুমন্দ দোলা লাগছে: শা-নওয়াজের কথাগুলোই ভাবছি আমি। এইজন্যেই ও এত লোভী, এত উদগ্র। ক্ষমা করতে চায় না, যা কাছে আসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় দু'হাত দিয়ে। পৃথিবীর ওপরে ও যেন প্রতিশোধ নেবে।

আমার মনের কথাটা কি বুঝতে পারলে ও? একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে আবার আরম্ভ করলে: তারপর এল যুদ্ধ। [illegible] ওয়ার। পৃথিবীর সবকিছু নিয়ে টান পড়ল একসঙ্গেই। আমার মতো অকেজো লোকও বাদ গেল না। সি. পি-র জঙ্গল থেকে বাঁশ কেটে আনবার কণ্ট্রাক্ট পেলাম, দু'বার মরতে মরতে বেঁচে গেলাম—একবার বাঘ, একবার ভালুকের হাত থেকে। আসামের পাহাড়ে মাতলা হাতী যখন মড়মড় করে আমার ছাউনি ভেঙে ফেললে তখন কী করে যে বেঁচে গিয়েছিলাম আজও জানি না। কিন্তু এইটে বুঝেছিলাম, মানুষের চেয়ে হিংস্র নয় ওরা। আর টাকা পেয়েছিলাম—অনেক টাকা। তারপরে নিলাম ধানচালের কণ্ট্রাক্ট। তারও পরে কী যে হল সে তো তুমি জানোই।

—তুমি ব্যবসায়ে লাল হয়ে গেলে।

—হ্যাঁ লাল হয়ে গেলাম—একধার থেকে পারচেজ করতে লেগে

গেলাম, রাশিরাশি মিথ্যে কথায় ঠকালাম নিজেকে, নিজের দেশের লোককে। আর পঞ্চাশ লাখ মরা মানুষের রক্তমাখা টাকায় বাড়ি কিনেছি, গাড়ি কিনেছি। কলকাতার রাস্তায় পায়ের নিচে মাড়িয়ে গেছি মড়া। ভাতের ফ্যানের জন্যে যখন জীবনের অপমান তার কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে দুয়োরে দুয়োরে কেঁদে বেড়িয়েছে, তখন দামী দামী খাবার কিনে কুকুরকেই খেতে দিয়েছি, মানুষকে নয়। মানুষ হাত পাতলে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি।

ওর কথাগুলো চাবুকের মতোই আঘাত করছে—আমি চমকে উঠলাম। গাড়ির স্পীড বাড়াচ্ছে শা-নওয়াজ, পাগলের মতো স্পীড বাড়াচ্ছে। মাইল-পোষ্টগুলোর ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে, স্প্রীংয়ের গদির দোলাটা যেন ঝাঁকানিতে রূপান্তর নিয়েছে। শা-নওয়াজের মুখটা অস্বাভাবিক রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, গগ্‌লসের ওপরে ধুলোর আবরণ। গতিকটা ভাল ঠেকছে না, অত্যন্ত অস্বাভাবিক লাগছে কথাবার্তাগুলো। একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটাবে না তো ?

বললাম, কী করছ পাগলের মতো ? এমন র‍্যাস চালাচ্ছো কেন ?

—ভয় করছে ? একটা স্নিগ্ধ হাসিতে ওর মুখ উজ্জ্বল আর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল : না না ভয় নেই। আমাদের মোটর এমনি স্পীডেই চলবে অনেকটা, অনেকদিন। অপঘাত একদিন তো আসবেই—কাজেই যতটা পারি চলার সাধ মিটিয়ে নিই, যতগুলো পারি কুকুরকে চাপা দিয়ে যাই। কিন্তু শা-নওয়াজ আবার হাসল : আজকে অন্তত: অ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। পি. ডব্‌লু. ডি-র চমৎকার রাস্তা, দেখতে পাচ্ছ না ?

আমি চুপ করে রইলাম।

তেমনি স্নিগ্ধস্বর বেজে উঠল শা-নওয়াজের গলায় : আচ্ছা থাক,

আস্তেই চালাচ্ছি। কিন্তু তুমি তো এখনো গাড়ি কিনতে পারনি রঞ্জন, তাই চলার আনন্দটা বুঝতে পারবে না। ব্লেসেড আর দোজ—।

রোদ প্রখর হয়ে উঠেছে। বিল আর ধানক্ষেতের দাক্ষিণ্য। কল্পনাই করা যায় না এত ধান সত্ত্বেও বাংলাদেশের ওপর দিয়ে কেমন করে এতবড় একটা মৃত্যুর স্রোত বয়ে গেল।

—আজ গ্রামে চলেছি। আর কোন উদ্দেশ্য নেই। শুধু দেখব যারা আমার ওপর এতখানি অত্যাচার করেছিল তাদের কতখানি প্রতিশোধ দিতে পেরেছি। দেখব আজ আমার মোটরের পথে কতটা বাধার সৃষ্টি করতে পারে ওরা।

নিঃশব্দে কাটল আরো খানিকটা। তার পরেই ঝপ্-ঝপাং। গাড়িটা একটা বাঁক নিয়েছে। পি. ডব্লু. ডি-র রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়েছে কাঁচা মাটির পথে। লোক্যাল বোর্ডের রাস্তা—প্রায় দুর্গম।

আমি বললাম, এই গ্রামের পথ?

—হাঁ, সামনেই গ্রাম।—শা-নওয়াজ যেন ঘুমের মধ্য থেকে জেগে উঠল: আমার হোম্ সুইট হোম্।

হেলে-দুলে এগোতে লাগল গাড়ি, কমতে থাকলো স্পীড। সামনেই বড় একটা খামারবাড়ি। শূন্য গোলা, ওপরের খড় ঝরে পড়েছে। দু'তিনটে বড়বড় ঘর মাটিতে লুটোবার উপক্রম করছে। বিষণ্ণ আম-বাগানের ছায়ায় যেন মৃত্যুর মধ্যে ঝিমিয়ে গেছে সমস্ত। শুধু কোথায় ঘুঘু ডাকছে—ক্লান্ত আর করুণ একটানা স্বর।

শা-নওয়াজ বললে, এই মোড়লের বাড়ি।

—মোড়লের বাড়ি?

—হ্যাঁ।—বিকৃত মুখে শা-নওয়াজ বললে, কিছু আর বাকী নেই। মন্বন্তর এদের শেষ করে দিয়েছে, এদের চাল কিনে আমি বিক্রি করেছি

চোরাবাজারে। অথচ একদিন—একদিন এদের বাড়িতে দু'বেলায় পঞ্চাশ জনের পাত্‌ পড়ত।

ঘ্যাচ্‌—ব্রেকে চাপ পড়েছে। মোটর থেমে দাঁড়াল।

ঘুঘুর ডাকটা বন্ধ হয়ে গেল—সামনে থেকে এই দিন-দুপুরেই দৌড়ে পালালো শেয়াল। কোথা থেকে ছড়িয়ে পড়ল কোনো একটা মৃত প্রাণীর জান্তব দুর্গন্ধ। আর ভেঙেপড়া সেই বাড়িটার থেকে বেরিয়ে এল একটা বুড়ি—পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিচিত্র একটা সামঞ্জস্য নিয়ে। অনাহার আর ব্যাধিবিশীর্ণ চেহারা—চোখে মুখে যুগান্তরের ক্ষুধা, অসংখ্য মৃত্যুর শোকচিহ্ন যেন রেখান্বিত। অনাহার-বিহ্বল চোখে আমাদের গাড়ির দিকে সে তাকিয়ে রইল। তার সর্বাঙ্গে একটা অর্থহীন আতঙ্ক, পাণ্ডুর ছায়াভাস। সে ভালো করে কিছু বুঝতে পারছে না, কিন্তু ভয় পেয়েছে।

—যা দেখছি—চাপা নিষ্ঠুর গলায় শা-নওয়াজ বললে, একজন টি'কে আছে এখনো। ওকেও যদি শেষ করতে পারতাম তাহলে অনুষ্ঠানটার কোথাও কিছু বাকী থাকত না। কী বলো রঞ্জন?

আমি আর কী বলব? যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি, আমার মাথার মধ্যে কী একটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। হয়তো অতিরিক্ত পথ চলবার ক্লান্তিতেই। ও কি নিষ্ঠুর, ও কি সিনিক্? অথবা যা বলছে তার উল্টোটাই ও মানে করতে চায়? আমি শুধু নির্নিমেষভাবে ওই বুড়িটার দিকেই তাকিয়ে রইলাম। বুভুক্ষু বাংলার প্রতিচ্ছবি।

—চলো, আরো এগিয়ে যাই। জাষ্ট্‌ দি শো বিগিন্‌স।

আম-বাগানের মধ্য দিয়ে ছায়াচ্ছন্ন দুর্গম পথ। ক্রমশই ঝাঁকানি লাগছে। নাইন্টিন ফরটিফোর মডেল টিপটপ আমেরিকান গাড়ি বাংলার পল্লীর এই গ্রাম্যতাকে ঠিক বরদাস্ত করতে পারছে না। স্প্রীংয়ের গদিতে বসেও ব্যথা পাচ্ছি।

কিন্তু ঘস্-স্—আবার গাড়িটা থেমে গেল।

—কী হল?

শা-নওয়াজ বললে: আর পথ নেই, সব কবর।

—কবর?

—হ্যাঁ, কবর। রাস্তাঘাট সব জুড়ে কবর দিয়েছে, আল্লাতলী—অর্থাৎ আল্লার দরবারে এত লোকের ঠাঁই হয়নি একসঙ্গে। তাই বাংলা-দেশের মানুষ বাংলার পথেঘাটে সব জায়গাতেই ছড়িয়েছে মৃত্যুশয্যা। আমার ধানচালের কণ্ট্রাক্ট সার্থক হয়েছে।

শা-নওয়াজ হাসল। হাসল কি? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—মানুষ নেই, কিন্তু কবর আমার মোটরের পথ আটকে দিয়েছে। চলো শহরেই ফিরে যাই। সেখানে সাফ্ রাস্তা। সরকারী লরী আছে, ডেষ্টিট্যুট ক্যাম্প আছে, মড়ায় পথ আটকাবার ভয় নেই।—চাকার নিচে একরাশ ভাঁট-ফুলের অরণ্যকে মর্দিত করে শা-নওয়াজ গাড়ির মোড় ঘুরিয়ে দিলে।

আবার কাঁচা-রাস্তায় ঝাকানি খেতে খেতে আমাদের নতুন মোটর এগিয়ে চলল পি. ডব্লু. ডি-র মখমল মসৃণ রাজপথের দিকে। আর, শোনা যায় না প্রায় এমনি নিঃশব্দ গলাতে আমার কানের কাছে মুখ এনে শা-নওয়াজ বললে—আচ্ছা বলতে পারো, রঞ্জন, মরা-মানুষ আবার কি বেঁচে ওঠে কোনোদিন? কবর ফুঁড়ে তারা কি উঠে আসে কখনো?

তীর্থযাত্রা

মেঘনার জল কালীদহের মতো কালো। কালো কালো ঘূর্ণি যেন সাপের মত কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। টলমল করে উঠেছে এতবড় ভাওলী নৌকাখানা। নরোত্তম বললে, হুঁসিয়ার ভাই হুঁসিয়ার।

কঠিন মুঠোতে হালের আগা আঁকড়ে ধরে ফরিদ মাঝি তাকালে আকাশের দিকে। উত্তরে যেখানে তীরতটের কাছে গাংশালিকের ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে আর নিরবচ্ছিন্ন খানিকটা সবুজ অরণ্যকে দেখা যাচ্ছে ঝাপসা ভাবে, ঠিক ওইখানে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের রাশ জমে উঠেছে। ফরিদ মাঝি জানে লক্ষণটা ভালো নয়। কালো কালিন্দীর মতো মেঘনার জল থেকে কালীয়নাগের বিষ-নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে যে কোন মুহূর্তে ওই হাঁসের পাখার মতো মেঘ কষ্টিপাথরের রঙ ধরে দিগদিগন্তকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। তারপর মাতাল মেঘনা তো রইলই।

ঘূর্ণির আকর্ষণে ভাওলী নৌকা থরথর করে কাঁপছে। নিজের অজ্ঞাতেই নরোত্তমের একখানা হাত চলে গেছে মলিন পৈতার গুচ্ছের ভেতরে। নাঃ—নিজের প্রাণের ভয় করে না নরোত্তম। জীবন তো পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো, একদিন টপ করে ঝরে যেতে পারে। দেহতত্ত্বের গানে বলেছে, ধূলোর দেহ একদিন ধূলো হয়ে যাবেই—কালের অনিবার্য করাল স্পর্শকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না কোনোদিন। ধূলো না হয়ে দেহটা জলে জলাঞ্জলি হয়ে গেলেও নরোত্তমের দিক থেকে

আক্ষেপ নেই কিছু। কিন্তু এতগুলো প্রাণীকে জলে ডুবিয়ে মারলে যে মহাপাতক এসে তার ওপরে অর্শাবে, তার জন্যেই নরোত্তম খুব বেশি পরিমাণে চিত্ত-চাঞ্চল্য বোধ করেছে।

—ও মাঝি ভাই, হুঁসিয়ার। দেখো, সবসুদ্ধ জলে ডুবিয়ে মেরো না যেন।

ক্যাচ্। নৌকাটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হাল ঘুরে গেল। বিন্দু বিন্দু ঘামে ফরিদের দু'হাতে কঠিন মাংসপেশী দুটো জ্বলছে—শক্তি আর আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। করকরে ভাঙা-গলায় ফরিদ বললে, তুমি চুপ করে বসো না ঠাকুর। পাঁচপীরের নাম নিয়ে পাড়ি ধরেছি—যা করবার আল্লা করবেন।

ফরিদের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল নরোত্তম। লোকটা দেখতে কুৎসিত। শুধু কুৎসিত নয়—ভয়ঙ্কর। পুরু পুরু প্রকাণ্ড ঠোঁট দুটো কাত্‌লা মাছের মত বাইরের দিকে ঝুলে পড়েছে। অসংখ্য লাল লাল শিরায় রেখাঙ্কিত চোখে যেন একটা ক্ষুধার্ত বন্য জন্তুর পিঙ্গল হিংস্রতা। গালে আর কপালে রাশি রাশি ব্রণের ক্ষতচিহ্ন। নিষ্ঠুর উদ্দাম মেঘনার সঙ্গে যেন কোথায় ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে লোকটার।

কিন্তু পাঁচপীর! বিশাল মেঘনার দিকে তাকিয়ে যেন আশ্বাস পায় না নরোত্তম। শুধু পাঁচপীরেই কুলোবে না। এই নদী পাড়ি দিতে তেত্রিশ কোটি দেবতার দরকার—নইলে উনপঞ্চাশ পবনকে ঠেকাবে কে? একটা বরুণ-মন্ত্র জানা থাকলে সুবিধে হত, জপ করা যেত এই সময়ে। ময়লা পৈতার ভেতরে নরোত্তমের আঙুলগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল।

নৌকায় অনেকগুলি প্রাণী। সবাই মিলে তারস্বরে কোলাহল জুড়ে দিয়েছে তারা। নরোত্তমের মেজাজ আরো বেশি করে বিগড়ে গেল। একা কত দিক সামলানো যায়!

ভাদ্রের ভরা গাঙ্। আকাশে শরতের নীলাঞ্চল মায়া ছড়িয়েছে। দূরে আধডুবো চরের উপরে চিকচিক করছে সোনা মাখানো বালি, স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠেছে কাশের ফুল। পাড়ের কাছে গাংশালিকের ঝাঁক উড়েছে। আশ্বিন আসন্ন।

পূর্ব-বাংলার নদী দিয়ে এই সময়ে চলাচল করে অসংখ্য ভাউলী নৌকা—নরোত্তমের এই নৌকাখানার মতো। ঘরে ঘরে দুর্গাপূজা—আনন্দ-মুখরিত শারদীয়ার আয়োজন। দেশ-বিদেশ থেকে ব্যবসায়ীরা বড় বড় নৌকায় বোঝাই দিয়ে পাঁঠা বিক্রি করতে আনে। মহিষমর্দিনী চণ্ডিকার মহাপ্রসাদ।

কিন্তু তেরশো পঞ্চাশ সালের আশ্বিন মাস। বাংলার সীমান্তে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়েছে—মেঘনার উত্তর দিগন্তে মহানাগের বিষ-নিঃশ্বাসের মতো। এসেছে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। ভাঙা-চণ্ডীমণ্ডপে সাপ আর শেয়াল এসে বাসা বেঁধেছে। বোধনতলায় ছড়িয়ে আছে নরমুণ্ড। দেবী এবার আদৌ মর্ত্যে আসবেন কি না পঞ্জিকায় উল্লেখ নেই। কিন্তু তাঁর দোলা-চৌদোলা যে আগে থেকেই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহ করবে কে? শাস্ত্র বলেছে, ফল মড়কং।

তাই পাঁঠার নৌকায় এবার পাঁঠা নেই। এবার নতুন পদ্ধতিতে দেবী-পূজার ব্যবস্থা। শহরের পূজামণ্ডপে ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্ত স্বর্ণযজ্ঞের আহুতি। বাংলার ঘরে ঘরে মঙ্গল-প্রদীপের শিখা নিবে গেছে, ছায়াকুঞ্জের নিচে সোনার পল্লীতে কল্যাণী গৃহবধূর কাঁকন আজ আর ছলভরে বেজে উঠছে না। ব্ল্যাক-আউটের দিনেও নিবে যাওয়া তুলসীতলার প্রদীপ সহস্র ছটায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে মহানগরীর গণিকা-পল্লীতে। সন্ধ্যাশঙ্খের শেষ পরিণতি হয়েছে ঘুঙুরের শব্দে, হারমোনিয়ামের বেতালা মত্ততায়, মাতালের জড়িত চীৎকারে। যুদ্ধের কণ্ট্রাক্টে যাদের রাতারাতি গৌরীসেনের ভাণ্ডার

খুলে দিয়েছে, আজ সোনার বাংলা তাদের কাছে প্রতিফলিত হয়েছে সোনালী মদের ফেনিল পাত্রের ভেতরে।

নতুন পুজোর নতুন ব্যবস্থা। দেবী আর ভোলা মহেশ্বরের ভিখারিণী গৃহিণী নন—কুলত্যাগ করে তিনি কুবেরের অঙ্কলক্ষ্মী হয়েছেন। বাংলার নারীত্বও তাই আজ বিশ্বমাতার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করেছে। যাজন-যজন নরোত্তমের পৈতৃক ব্যবসা, নতুন কালের হাওয়ায় তার রূপান্তর ঘটেছে। পাঁঠার নৌকায় একদল নারী বোঝাই দিয়ে নরোত্তম বিক্রী করতে চলেছে শহরে। শ্মশান বাংলার গ্রামে গ্রামে রিক্ত মহেশের দীর্ঘনিঃশ্বাস ঘূর্ণি হাওয়ায় কেঁদে বেড়াচ্ছে।

নৌকার ভেতরে কলহ কোলাহল আর দাপাদাপি। ভাউলীখানা বাঁদিকে কাত হয়ে পড়ল। বলিষ্ঠ মুঠিতে নৌকার হালে মোচড় দিয়ে ফরিদ বললে, তোমার সোয়ারীদের একটু থামাও না ঠাকুর। যে হট্টগোল বাধিয়েছে। ঝড় আসবার আগেই ওরা ডুবিয়ে দেবে দেখছি।

ছইয়ের ভেতর মুখ বাড়িয়ে দিলে নরোত্তম।

—এই কী হচ্ছে ওখানে? একটু ক্ষান্ত হয়ে বোসো না সবাই।

কিন্তু ক্ষান্ত হবার মতো মনের অবস্থা নয় কারো। তের থেকে ত্রিশ পর্যন্ত নানা বয়সের এক দঙ্গল মেয়ে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাদুড়ের ছানার মতো ঝুলে রয়েছে তিন চারটি শিশু। নরোত্তমের মতে এরা নিতান্তই অনাবশ্যক বোঝা, কিন্তু বর্জন করাবার উপায় নেই। কালো কালো জীর্ণ দেহ কতগুলো মানবের সমষ্টি। দেখলে বাৎসল্য জাগে না, পা ধরে টেনে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে মেঘনার অথই জলের মধ্যে। আরো যত বিড়ম্বনা ওই অপোগণ্ডগুলোকে নিয়েই।

ছোট ছেলেটাকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে চীৎকার করছে সরলা। ছেলেটার অঙ্গ-সংস্থান দেখলে মনে হয় কারো অসতর্ক খেয়াল

কালো চামড়ায় ঢাকা অসংলগ্ন কতগুলো অপরিণত অবয়বকে জুড়ে দিয়েছে এক সঙ্গে। ঘাড়ে পিঠে দগদগ করছে ঘায়ের চিহ্ন—চোখ মেলে সেদিকে তাকিয়ে থাকলে ঠেলে যেন বমি আসতে চায়। কিন্তু ওই বিকৃত জীবনটা-কেই ঐকান্তিক ক্ষমতায় আঁকড়ে রেখেছে সরলা—বাইরের এতটুকু কাঁটার আঁচড় অবধি যেন সইতে দেবে না।

—তুমিই এর বিচার করো ঠাকুর। অমন ভালোমানুষ সেজে বাইরে বসে থাকলে চলবে না।

—কী বিচার করব আবার?—খেঁকিয়ে উঠল নরোত্তম।—জোড় হাত করে বলছি, জিবে শান দেওয়াটা একটু বন্ধ রাখো সকলে। শুকনো ডাঙায় উঠে যত খুশি চেঁচিয়ো, কিন্তু এখন—

সরলা কিন্তু থামতে চায় না। অদ্ভুত গলা—কানের মধ্যে শাণিত হয়ে বিঁধে যায় এসে। মাথার রুক্ষ চুলগুলো ঘাড়ের দু'পাশে গোছায় গোছায় ভেঙে পড়েছে—যেন রক্ষাচণ্ডীর মূর্তি। দেখে নরোত্তমের ভয় করে।

—জানি, জানি, সুখীর ওপরেই তোমার যত নেকনজর। ওকে একটা কথা বলতে গেলেই তোমার বুক চড়চড় করে ফেটে যায়। অতই যদি এক-চোখোমি, তা'হলে ওকে নিয়ে মনের সাধে নৌকা-বিলাস করলেই তো পারো। সবগুলোকে এক নৌকোয় ঠেলে তুলেছ কেন?

—আহা-হা থামো না। কেন এমন করে চীৎকার করছ, থামো না? —গলার স্বর শান্ত আর কোমল করবার চেষ্টা করলে নরোত্তম—বোঝই তো সব, একসঙ্গে চলাফেরা করতে গেলে—

আড়চোখে নরোত্তম তাকালো সুখীর দিকে। আঠারো-উনিশ বছরের সুশ্রী মেয়ে। জাতে জেলে, কিন্তু মুখের শ্রী-ছাঁদ দেখলে সে কথা মনে হয় না কারো। বাইরে নৌকোর গায়ে কালো জল খেলা করছে, তার নির্নিমেষ চোখ দুটো নিবদ্ধ হয়ে আছে সেই জলের ওপর। নিজের

ভেতরেই যেন একান্তভাবে নিমগ্ন হয়ে আছে সে। তাকে কেন্দ্র করে এত কলহ আর কোলাহল, কিছুই যেন তার কানে যাচ্ছে না।

দেখে অদ্ভুত একটা মায়া হল নরোত্তমের। মেয়েটার ভেতরে এমন একটা কিছু আছে যা সমস্ত মনকে অকস্মাৎ যেমন ব্যথিত, তেমনি পীড়িত করে তোলে। কিন্তু কী করতে পারে নরোত্তম? ব্যবসা ব্যবসাই, তার ওপরে কারো কোনো কথা চলে না।

সরলার চীৎকারের কিন্তু বিরাম নেই।

—খামোকা? খামোকা আমি চেঁচিয়ে মরছি, না? জিজ্ঞেস করো না তোমরা ওই আদরের সুখীকে। আমার ছেলের গায়ে ঘা, আমার ছেলে মরে যাবে? তোর গায়ে ঘা হোক হারামজাদী, তুই মর—মর—মর—

মট্ মট্ করে আঙুল মটকাবার শব্দ কানে এল। সরলার চোখ রাক্ষসীর মতো জ্বলছে। চমকে ছইয়ের বাইরে গলা টেনে নিলে নরোত্তম। যেন সরলার অভিশাপটা সাপের ফণার মতো উদ্যত হয়ে উঠে ঠকাস্ করে তারই বুকে একটা ছোবল মারবে।

দুর্বল গলায় নরোত্তম বললে, যাচ্ছ একটা ভালো কাজে, কালীঘাটে মা কালীর দরবারে। কিন্তু যা আরম্ভ করেছ তাতে মাঝ গাঙে নাও ডুবিয়ে তবে তোমরা ছাড়বে।

হালের মাচায় ফরিদ মাঝি পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে নিশ্চল হয়ে। উত্তরের আকাশে পেঁজা তুলোর মতো যে মেঘের টুকরোটা দেখা দিয়েছিল, হাওয়ার মুখে আবার যেন তা দিকচিহ্নহীন নীলিমার বুক বেয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। গাংশালিকের ঝাঁক চক্রাকারে ঘুরছে মাথার ওপর। গলুয়ের সামনে বসে যে দু'জন মাল্লা দাঁড় টানছে, তাদের পিঠে শুকনো ঘামের ওপর চিকচিক করছে শাদা শাদা লবণের বিন্দু।

কাত্লা মাছের মত প্রকাণ্ড মুখখানায় খানিকটা ভয়ঙ্কর হাসি ফুটিয়ে তুলেছে ফরিদ।

—আর ভয় নেই ঠাকুর। ঝগড়ার চোটেই তুফান পালিয়েছে। যা সোয়ারী তুমি নিয়েছ, মেঘনার সাধ্য নেই যে এদের গিলে হজম করতে পারে।

—তা ঠিক।—অন্যমনস্ক ভাবে হেসে বিড়ি ধরালো নরোত্তম।

সত্যি এ এক মহা ঝকমারীর কাজ। পরোপকার করতে গেলেও বিঘ্ন অনেক, অনেক বিড়ম্বনা। গাঁটের কড়ি খরচ করে সে এদের কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে, কালীঘাটে কালী দর্শনও করাবে, তাতেও তো মিথ্যে নেই কিছু। তারপরে? তারপরে যা হবে তার জন্যে তো আর দায়ী করা চলে না নরোত্তমকে। দেশ-গাঁয়ে পড়ে থেকে ভিটে কামড়ে মরে যাচ্ছিল সমস্ত, তার চাইতে এ সহস্র গুণে ভালো। তাসের গড়া সংসার তো দুর্ভিক্ষের একটা দমকাতেই ভেঙ্গে পড়েছে। ঠুনকো আত্মসম্মান; পেটে ভাত না পড়লে যে তার এতটুকুও দাম নেই, এ সত্য নরোত্তম ভালো করেই জানে।

তাছাড়া এমন দোষই বা আছে কোনখানে। কলকাতায় যারা এই জীবনকে মেনে নিয়েছে সহজ ভাবে, কেমন সুখে আছে তারা। শহরের সমস্ত বড়লোক তাদের পায়ের তলায় মাথা বাঁধা দিয়ে বসে আছে। রাত্রির আলোয় তাদের রঙ মাখা মুখগুলো দেখে অপ্সরা বলে মনে হয়, ঋষি-মুনিরও বিভ্রম জাগে তাতে। গায়ে জড়োয়ার গয়না, দামী দামী শাড়ীর চটক। ওদের একটি হাসির জন্যে মানুষ ভিটে-মাটি বন্ধক দেয়, ওদের অবজ্ঞার অপমানে লাখপতি আত্মহত্যা করে। ঘুঁটেকুড়ুনি থেকে রাজরাণী হতে পারে সবাই, নরোত্তমের সান্ত্বনা শুধু যৎকিঞ্চিৎ দালালী ছাড়া আর কিছুই নয়। নিঃস্বার্থ সেবাব্রত ছাড়া আর কোন আখ্যা দেওয়া চলে একে?

ফরিদ হাসে।

—ভালো ব্যবসা তোমার ঠাকুর। ধান চাল পাটের চাইতে ঝক্কি ঢের কম, কাঁচা পয়সা অনেক বেশি। আগে জানলে কে এমন করে নৌকো ঠেলে মরত ?

নৌকোর ভেতর দিকে আড়চোখে তাকালো নরোত্তম। সন্ত্রস্ত গলায় বললে, চুপ চুপ।

ফরিদ তবুও হাসছে। কিন্তু সত্যিই কি হাসছে! ওর চোখ দুটো দেখে নরোত্তমের সন্দেহ হল।

—তুমি তো বামুন। সমাজের ইজ্জত বজায় রাখা তোমার কাজ। ঘরের পর ঘর উজাড় করে মেয়েদের বিক্রি করে দিচ্ছ পেশাকারদের কাছে—সমাজের মুখে হাজার বাতির রোশনাই জ্বলে উঠছে নিশ্চয়।

নরোত্তম জবাব দিল না, কথাটা সে যেন শুনতেই পায়নি। নীরবে চিন্তাকুল মুখে সে শুধু বিড়িটা টেনে চলল। ফরিদের কথায় মাথার মধ্যে হিন্দুত্বের রক্ত চন চন করে উঠল একবার। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাধাবার মতো সময় এ নয়, মনের অবস্থাও নয়। এই হিংস্র উন্মত্ত নদীর কাণ্ডারী ওই লোকটা ইচ্ছে করলেই পাকের মধ্যে নৌকো ফেলে দিয়ে সবসুদ্ধ একসঙ্গে পাতালপুরীতে পৌঁছে দিতে পারে।

ফরিদ আবার বললে, ঠাকুরমশাই, মরে তুমি বেহেস্তে যাবে।

নরোত্তম তবু জবাব দিল না। বলছে বলুক। ও সব ছোট কথায় কান দিতে গেলে অনেক কাল আগেই সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে হত। বিপন্ন নারীর একটা সুবন্দোবস্ত করে দিলে পাপ হবে এমন কথা শাস্ত্রে লেখা নেই কোথাও। কিন্তু ফরিদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। শাস্ত্রের গভীর রহস্য যবনে কেমন করে বুঝবে ?

মেঘনার মেঘবরণ জল প্রশান্ত মন্থর গতিতে চলেছে সমুদ্রের দিকে। অজস্র হাওয়ায় রাশি রাশি ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, নদীর বুকে ফুটছে ফেনার ফুল। যেন কালীনাগের হাজার ফণা ছোবল তুলছে একসঙ্গে। মহানাগের কুণ্ডলীর মতো এখানে ওখানে চক্রাকারে 'উলাস' দিচ্ছে শুশুকের দল। নৌকোর পচা কাঠ আর জলের একটা মিষ্টি গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে বাতাস।

নৌকোর ভেতর থেকে গুনগুন করে একটা গানের আওয়াজের মতো কানে আসছে। সরলার চীৎকার থেমে গেছে, কিন্তু গান গাইছে কে? সাগ্রহে কান পাতল নরোত্তম। না, গান নয়। সুমতি কাঁদছে। তারই চোখের সামনে তার স্বামী একরাশ বুনো লতা চিবিয়ে ভেদবমি হয়ে মরেছে, সেই শোকেই কাঁদছে।

কাঁদছে—কাঁদছে! নরোত্তমের মেজাজ যেন সপ্তমে চড়ে যায়। কেন কাঁদে, কার কাছে কাঁদে? কে আছে কান্না শোনবার জন্যে? অথচ সবাই কাঁদছে। মরবার আগে সপ্তমে চেঁচিয়ে কাঁদছে, মরবার সময় অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরে গুমরে কাঁদছে। তবু ভালো, মরবার পরে মানুষের কান্না শোনা যায় না। তা'হলে সে কান্নার শব্দে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যেত।

গুনগুন করে সুমতি কাঁদছে। নরোত্তমের দু'হাতে কান চেপে ধরতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে গলার ভেতর একটা গামছা ঠেসে দিয়ে সে কান্না বন্ধ করে দেয় সুমতির। তাদের পাশের গাঁয়ে একবার একটা খুন দেখেছিল নরোত্তম। সম্পত্তির লোভে বিধবা বড় ভাজের গলার ভেতর একখানা আস্তো থান কাপড় ঠেলে দিয়েছিল ছোট দেবর। মেয়েটার অস্বাভাবিক হাঁয়ের চেহারা দেখে তাকে মানুষ বলে মনে করবার উপায় ছিল না, চিরে যাওয়া গালের দু'পাশ দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত নেমে তার গলা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছিল। উঃ, কত রকম বীভৎস ভাবেই যে মরতে

পারে মানুষ! এই দুর্ভিক্ষের সময় পূর্ব-বাংলার গ্রামে গ্রামে যে তার রঙ-বেরঙের ছবি দেখেছে।

ঝপ ঝপ ঝপাস্। পাশ দিয়ে বারো দাঁড়ের একখানা ছিপ বেরিয়ে যাচ্ছে। মেঘনার জল থেকে উঠে আসা প্রেতমূর্তির মতো একদল অস্থিসার মানুষ দুর্বল হাতে দাঁড় টেনে চলেছে। বড় ভাউলীখানা দেখে বারো জোড়া [illegible] চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল।

সমস্বরে প্রশ্ন এল : চাল আছে নৌকায় ?

—না।

—ধান আছে ?

—না।

বারো জোড়া হাতের দাঁড়ের টানে ছিপ এসে ভিড়ল ভাউলীর গায়ে। পাটাতনের ভেতর থেকে দু'তিনটে ল্যাজার ফলা ঝিকিয়ে উঠল একসঙ্গে।

—ধান চাল থাকে তো না দিয়ে এক পা এগুতে পারবে না।

হালের মুখে ফরিদ মাঝির পেশী কঠিন হয়ে উঠেছে।—হুঁসিয়ার। নৌকোয় সব জেনানা। ধান চালের দরকার থাকে অন্য তল্লাটে যাও, একটা দানাও মিলবে না এখানে।

পৈতে আঁকড়ে ধরে নরোত্তম দুর্গানাম জপছে, নৌকোর ভেতর থেকে উঠেছে মেয়েদের কান্না। কিন্তু একটিবার ভেতরে উঁকি দিয়েই বারো জোড়া চোখের আগুন নিবে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

—জাহান্নামে যাও।—বারোটি কণ্ঠে চাপা অভিসম্পাত। ঝপ ঝপ ঝপাস্। বারো দাঁড়ের ছিপ স্রোতের টানে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

নরোত্তমের ঠোঁট তখনো থরথর করে কাঁপছে। বড় রক্ষা পাওয়া গেছে এ যাত্রা। প্রাণে আর বল ছিল না, বুকের রক্ত শুকিয়ে গিয়েছিল

একেবারে। ল্যাজা দিয়ে ফুঁড়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে মা বলতেও নেই, বাপ বলতেও নেই।

—ব্যাটারা ডাকাত নিশ্চয়।

কুশ্রী কুৎসিত মুখে ফরিদ ভয়ঙ্কর একটা হাসি হাসল।

—হ্যাঁ ঠাকুর, ওরা ডাকাত। তোমার মতো সাধু ফকির নয়।

সাধু ফকির! কথাটা কানে গিয়ে লাগে। সন্দিগ্ধ চোখে ফরিদের দিকে তাকালো নরোত্তম। হাঁ, ঠাট্টাই করছে। কিন্তু যা বলে বলেই যাক—উত্তর দেবার সময় এখনো আসেনি।

পালে জোর বাতাস লেগেছে, তর্‌তর্ করে ঢেউ কেটে বেরিয়ে চলেছে নৌকো। চরের ওপর শাদা কাশবনে চখা-চখী উড়ছে। বহু দূরে কোথা থেকে ভেসে আসছে ঢাকের অস্পষ্ট শব্দ। আজ থেকে কি মহা-পূজোর বোধন লাগল?

উপরে নির্মেঘ নীল আকাশ। বাংলাদেশের শরৎ যেন তার স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন আঁখি মেলে দিয়েছে। সোনার শরৎ। ঘরে ঘরে নতুন ধান—নবান্নের শুভ-সম্ভাবনা। ফুলে আর পাতায় পদ্মদীঘির জল দেখা যায় না। শিশির আর শেফালী ফুলের গন্ধ মেখে বাংলার মাটি যেন শারদার পূজামণ্ডপ।

কিন্তু সে কোন্ বাংলা? কবেকার বাংলা, কত শতাব্দী আগেকার? এখানে মেঘনার জল কালীয়নাগের নিঃশ্বাসে কালো হয়ে গেছে। এখানে মড়কে জর্জরিত বাংলার বুক থেকে গৃহচ্যুত গৃহলক্ষ্মীরা পণ্য হতে চলেছে শহরের গণিকা-পল্লীতে। অভিশপ্ত শরৎ—দুঃস্বপ্নের শরৎ। ভিখারী মহেশ্বরের গৃহিণী আজ কুলত্যাগিনী।

নৌকোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সুখী দাঁড়িয়েছে নরোত্তমের পাশে। তার দু'গাল বেয়ে টপটপ করে চোখের জল পড়ছে।

—কিরে সুখী, হল কি তোর ?

—ঠাকুরমশাই, ছেড়ে দাও আমাকে। দোহাই তোমার—আমাকে ছেড়ে দাও।—দু'হাতে নরোত্তমের পা জড়িয়ে ধরেছে সুখী।—আমি তীর্থ-দর্শন করতে চাই না, আমি কলকাতায় যেতে চাই না। আমাকে বাবার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

—আহা-হা, কেন পাগলামি করিস!—সন্ত্রস্ত হয়ে টেনে পা সরিয়ে নিলে নরোত্তম। বাপের কাছে ফিরে যাবি। কী করবি সেখানে গিয়ে ? না খেয়ে শুকিয়ে মরবি যে।

—মরি মরব। আমার সেই ভালো ঠাকুরমশাই। আমি কলকাতায় যাবো না। আমাকে ছেড়ে দাও—আমি চলে যাই।

—ছেড়ে দেব!—সুখীর অসঙ্গত আবদারে বিস্ফারিত চোখে নরোত্তম তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। দেড়শো টাকা বাপকে গুণে দিয়ে তবে মেয়েটিকে আনতে হয়েছে। সেই দেড়শো টাকা সুদে-আসলে একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে! যতই ধর্মে মতি থাকুক না, নরোত্তম দাতাকর্ণের পোষ্যপুত্র নয়।

সুখীর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল পড়ল নরোত্তমের পায়ের ওপর। কী উষ্ণ জলটা—সমস্ত শরীর তার স্পর্শে যেন চমকে উঠেছে। অপূর্ব সুন্দর সুখীর মুখখানা। নরোত্তমের মনটা হঠাৎ যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

অনেক দূরে নদীর ওপারে গ্রামের আভাস। কত আশা, কত স্বপ্ন দিয়ে গড়া মানুষের আশ্রয়। কিন্তু কি আছে ওখানে ? রিক্ত ধানের মরাই ভেঙে পড়েছে মাটিতে। উড়ছে শকুন। ওইখানে ফিরে যেতে চায় সুখী। কী করবে গিয়ে ? আরো দশ জনের মতো না খেয়ে ছটফট করে মরে যাবে, নয়তো মেঘনার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সমস্ত দুঃখের অবসান করবে। তার চাইতে—

—আচ্ছা, এখন চুপ করে বোস তো গিয়ে। ঘাটে নৌকো লাগুক তারপরে দেখা যাবে।

কিন্তু ঘাট কোথায়! নদী চলেছে তো চলেইছে! বাঁকের পর বাঁক ঘুরছে, পেছনে ফেলে যাচ্ছে খাড়া পাড়ি। ভেঙে-পড়া গ্রাম। সন্ধ্যার আগে আর কোনো বাজার বা গঞ্জ পাওয়া যাবে না।

নৌকোর ভেতরে কোলাহলের বিরাম নেই। সুমতি কাঁদছে, সরলার ছেলেটা চীৎকার করছে। এক গা দগদগে ঘা নিয়ে ছেলেটা বাঁচবে না, কবে যে চোখ উল্টে শেষ হয়ে যাবে তারও ঠিক নেই। তবু অসীম মমতায় সরলা ওই বিকৃত শিশুটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে আছে। বিরক্তিতে নরোত্তমের সমস্ত মনটা বিস্বাদ আর বর্ণহীন হয়ে যায়। ওদিকে মালিনী সুর টেনে কৃষ্ণযাত্রার গান ধরেছে। দলের মধ্যে ওই মেয়েটা যা একটু হাসি-খুশি—নিজের সম্বন্ধে ভাবনা নেই, দুশ্চিন্তাও নেই কিছু। অল্পবয়সে বিধবা হওয়ার পরে গাঁয়ের অনেকগুলো ছেলের সে মাথা খেয়েছে এই রকম জনশ্রুতি শুনতে পাওয়া যায়। তাকে আনবার জন্যে নরোত্তমের বেশি কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি, এক কথাতেই সে প্রসন্ন-মুখে নৌকোয় উঠে এসেছে।

—'কালো রূপে মোর মজিল যে মন, ঝাঁপ দেব কালো যমুনায়'—

মালিনী বেরিয়ে এসে বসেছে ঠিক নরোত্তমের পাশটিতে।

—জলের রংটি দেখেছ ঠাকুর? ঠিক যেন কালো যমুনা।

—হুঁ।

—আমি রাধা হলে ঠিক ওই জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম—অপূর্ব একটা ভ্রূভঙ্গি করে হাসল মালিনী: তারপর ঠাকুরের যে বাকি্য হরে গেল। আমার মুখের দিকে একবার তাকালেও দোষ নাকি?

—না, না, অমন কথা কে বলে!—জোর করেই হাসবার চেষ্টা করলে নরোত্তম: কিন্তু মৎলবটা কী?

—একটা পান খাওয়াতে পারো না? সকাল থেকে পান না খেয়ে মাথা ধরে গেল যে।

—এখন কোথায় পাবে পান? একটা ঘাট আসুক, তার পরে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

—তুমি বড় বেরসিক ঠাকুর। 'আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না'—চটুল একটা কটাক্ষপাত করে লীলায়িত ভঙ্গিতে ভেতরে চলে গেল মালিনী।

নরোত্তম একটার পর একটা বিড়ি টেনে চলেছে বিষণ্ণ মুখে। সুখীর জন্যেই ভাবনা: মেয়েটা চুপ করে বসে, নির্নিমেষ চোখ মেলে চেয়ে থাকে জলের দিকে। সরলা, সুমতি কিংবা অন্যান্য মেয়েদের জন্যে চিন্তার কিছু নেই। যতই হট্টগোল করুক, শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া চলবে। কিন্তু সুখীকে বিশ্বাস নেই, ওর চোখের জলকে বিশ্বাস নেই। যখন তখন ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে মেঘনার কালো জলের মধ্যে, ঘটাতে পারে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড।

তাই নরোত্তম আগে থেকেই সুখীর জন্যে একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। গোলাম মহম্মদের সঙ্গে কথা হয়েছে তার।

আরো দুটো বাঁক পেরোলেই কাশীপাড়ার চক। সেখানে ঘন কাশবনের ওপারে কী আছে দেখা যায় না। আর সেইখানেই খালের মাথায় মিলিটারী কলোনীর ঠিকাদারের নৌকো থাকবার কথা।

কিন্তু মনের দিক থেকে কেমন যেন জোর পায় না সে। সুখীর কথা ভাবলেই একটা অন্যায়—একটা বিচিত্র অপরাধ-বোধ এসে যেন তাকে

আচ্ছন্ন করে দেয়। মেয়েটার মুখখানা সত্যিই ভারী সুন্দর. নরোত্তমের মাঝে মাঝে লোভ হয়, এক একটা দুর্বল মুহূর্তে ভাবে—

হঠাৎ নৌকোর মধ্যে সরলার তুমুল চীৎকার। কলহের কলরোল নয়, বুকফাটা ডুকরে কান্না।

—কী হয়েছে, হল কী ওখানে? ডাকাত পড়ল নাকি?

—না।—মালিনীর গলা ভেসে এসেছে: না। সরলার ছেলে মরে গেছে।

কান্না আর হট্টগোল। তবু নরোত্তমের মনটা খুশি হয়ে উঠেছে—যেন একটা ভার নেমে গেছে চেতনার ওপর থেকে। ছেলেটা মরে গেছে, বোঝা কমেছে একটা। একে একে সবগুলো ছেলেপিলে অমনি করে মরে শেষ হয়ে যেতে পারে না? নৌকোর ভার কমে, শান্তি ফিরে আসে অনেকখানি। তাছাড়া চিরযৌবনের রাজ্যে সবৎসার চাইতে অবৎসার কদর বেশি।

মরা ছেলেটাকে সরলা বুক থেকে নামাতে চাচ্ছে না। আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদছে। কাঁদুক। শহরের আলোয় ওই কান্না মিলিয়ে যেতে কতক্ষণ লাগবে? সেখানে চিরবসন্তের দেশ। রাত্রির অপ্সরাদের চোখে কখনো জল দেখতে পায় না কেউ।

আর ফরিদ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তুফানের কোনো সংকেত নেই সেখানে, কিন্তু তার মনের প্রান্তে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। একটা কিছু ভাবছে, কিন্তু স্পষ্ট কোনো রূপ দিতে পারছে না।

তীর্থযাত্রীদের নৌকো চলেছে কালীঘাটে দেবতা দর্শনে। কুবেরের পূজা-মণ্ডপে নতুন কালের নতুন বলি। কণ্ট্রাক্টের টাকায় ফেঁপে উঠেছে নারীমাংসের কশাইখানা। নরোত্তমের মতো পরহিতব্রতীর সান্ত্বনা দালালীর কয়েকটা টাকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাথার ওপরে শরতের নির্মল নীলিমা। দূরে বোধনের বাজনা। অকাল বোধন নয়, আকাল বোধন। কিন্তু কে জাগবে এই বোধন মন্ত্রে? চৌরঙ্গীর হোটেলে সে আজ রঙ-মাখানো মুখে মদের গেলাসে চুমুক দিয়েছে।

বাঁকের পর বাঁক ঘুরে চলেছে নৌকো। দূরে যেখানে ঘূর্ণি হাওয়ায় লাল বালি উড়ছে, ওইখানে কাশীপাড়ার কাশবন। আস্তে আস্তে নৌকো এসে ভিড়ল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখলে নরোত্তম, দূরে মিলিটারী কলোনীর ঠিকাদারের নৌকোর মাস্তুল ঠিক আছে।

—সুখী, সুখী।

প্রত্যাশায় সমুজ্জ্বল মুখে সুখী এসে দাঁড়ালো। গালের দু'পাশে শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুর চিহ্ন। নরোত্তম কানে কানে বললে, এখানে তোকে নামিয়ে দিলে চলে যেতে পারবি? নদীর পার দিয়েই সোজা রাস্তা—

অগ্র-পশ্চাৎ ভাববার মতো মনের অবস্থা নয় সুখীর। সমস্ত প্রাণ তার চীৎকার করে কাঁদছে। বাবাকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না, থাকতে পারে না তার ছোট ভাইটিকে ছেড়ে। না খেয়ে যদি মরতে হয়, সবাই একসঙ্গেই মরবে। তবু সে যাবে না কলকাতায়। মা-কালী দর্শন করে তার কোনো লাভ নেই।

ঘন জঙ্গল আর কাশবন। ওপারে দৃষ্টি চলে না। নরোত্তম বললে, চল, তোকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসি। নদীর ধারে উঠলেই সোজা শড়ক।

কাশবনের মধ্যে অদৃশ্য হল দু'জনে। নরোত্তম বললে, একটু দাঁড়াও মাঝি ভাই, আমি আসছি।

কিন্তু ফরিদ নিদারুণ ভয়ে চমকে উঠেছে। সমস্ত মাথাটা ঝিমঝিম করছে তার। এ কী? কী করছে সে? যে অস্ত্রে শাণ দিচ্ছে একদিন সে অস্ত্র কি ওর নিজের গলাতেই এসে লাগতে পারে না? গ্রামে

তারও স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে। ছেলের বউ আছে। আজ যদি সে মরে যায়? কাল টাকার লোভে আর একজন যে এমনি করে তাদের নিয়ে মেঘনা পাড়ি দেবে না কে বলতে পারে? ফরিদের সমস্ত শিরাস্নায়ুর মধ্যে আগুন জ্বলে গেল। নরোত্তম ঠাকুরের মতো লোকের অভাব হয় না কোথাও—কোনোদিন।

ভয়ংকর মুখখানাকে আরো ভয়ংকর করে ফরিদ হাঁক দিলে মাল্লাদের।

—রহিম, কামাল, এদিকে আয় দেখি। তামাক সাজ তো এক ছিলিম।......

—কাশবনের ওপারে রহস্যময় নীরবতা। হঠাৎ সেই নীরবতা ভেঙে সুখীর আর্ত চীৎকার: ছাড়ো, ছাড়ো, বাঁচাও আমাকে—

চমকে ফরিদের হাত থেকে আগুনসুদ্ধ কলকেটা পড়ে গেল মেঘনার জলের মধ্যে। ও কার কান্না? মনে হল তার মেয়েই যেন চীৎকার করে কেঁদে উঠেছে। তার মেয়ে, তার স্ত্রী, আরো কত জন।

কিন্তু পরক্ষণেই সব নিস্তব্ধ। আর কাশবন ঠেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে নরোত্তম।

—মাঝি, মাঝি, শাগ্‌গির নৌকো ছেড়ে দাও। মস্ত কুমীর। কাশবন থেকে বেরিয়ে সুখীকে মুখে নিয়ে জলে নেমে গেল।

মেয়েরা এক সঙ্গে আতঙ্কে কিলবিল করে উঠেছে। এমন কি সরলার কান্না পর্যন্ত গিয়েছে থেমে।

—কুমীর?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—মস্ত কুমীর।—গোলাম মহম্মদের দেওয়া নোটগুলো ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে নরোত্তম লাফিয়ে উঠে পড়ল নৌকোতে, আর এখানে দাঁড়িয়ে কাজ নেই। হায় হায়, সুখীর কপালে এই ছিল—

ছইয়ের ওপর থেকে লম্বা একখানা লগি টেনে নিলে ফরিদ। কুৎসিত

মুখে একটা অমানুষিক হাসি হাসল।—কত বড় কুমীর ঠাকুরমশাই? কী নাম?

নরোত্তম কিছু একটা জবাব দেবার আগেই প্রচণ্ড বেগে লগির ধারালো খোঁচা তার চোখে এসে লাগল। উল্টে নৌকো থেকে কাদা আর বালির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নরোত্তম। একটা চোখ কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে, আর একটা অন্ধ হয়ে গেছে কচ্‌কচে বালিতে।

ভাউলী নৌকো ততক্ষণে অথই জলে। দূর থেকে ফরিদের করকরে গলা কানে ভেসে এল: এতখানি সহ্য হয় না ঠাকুরমশাই। না খেয়ে মরে তো মরুক, তবু গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

মূর্ছিতের মতো একরাশ জল-কাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো নরোত্তম। ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু উঠতে পারছে না। ওদিকে অদূরে জলের মধ্যে ভেসে উঠেছে পোড়া কাঠের মতো একখানা প্রকাণ্ড মুখ—তার দুটো চোখে জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে নরোত্তমকে লক্ষ্য করছে। অন্ধ না হলে নরোত্তম দেখতে পেতো ওটা সত্যি সত্যিই কুমীর।

ছলনাময়ী

এমন কত আসে, কত যায়, কেহ কাহারও কথা মনে করিয়া রাখে না। দেওয়ালের গায়ে কাঠকয়লায় মৃতের নাম স্থায়ী করিয়া রাখার চেষ্টা নিত্য নূতন লেখার অন্তরালে অস্পষ্ট হইয়া আসে, তারপর খুব ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেও একটা নামেরও স্পষ্ট পাঠোদ্ধার করা চলে না। চিতার পোড়া কয়লার স্তূপ জমিতে জমিতে আদি-গঙ্গার গর্ভ ভরিয়া ওঠে, হিন্দুর পাপ-ক্ষালনের বোঝা টানিতে টানিতে জননী ভাগীরথী শীর্ণা হইতে শীর্ণতরা হইয়া আসেন। ভাঁটায় নামিয়া যাওয়া ঘোলাটে জল আর পঙ্কিল তীরের অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ স্বর্গযাত্রার পথে নরকের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই শ্মশানঘাটেই দুইজনে দেখা হইয়া গেল। দক্ষিণ কলিকাতার অতি বিখ্যাত এই শ্মশানে কত সন্ন্যাসী-সাধু আসিল গেল, কত ধুনির আগুনের কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া ছাতের জলিয়া-যাওয়া সাদা রংটার উপর কালোর প্রলেপ বুলাইয়া দিল; তুলসীদাসের রামায়ণ, শঙ্করের মোহমুদ্গার, কামরূপের মন্ত্রসিদ্ধ অভিচার-তন্ত্র অথবা বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের বহু আলোড়নে এখানকার আকাশ-বাতাস মুখর হইয়া উঠিল; বাঙালী বিহারী পাঞ্জাবী মান্দ্রাজী,—তাহাদের আর সীমা সংখ্যা নাই। ইহারা তাহাদেরই দুইজন।

মনের মিলটা যেমন দুর্লভ, সুলভও তেমনই; সারা জীবন চেষ্টাতেও

অনেক সময় এ বস্তুটি ঘটিয়া উঠে না, আবার অতি সহজেই কোন্ একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে পরস্পরে কাছে আসিয়া পড়ে, সেটা একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

কাপালিক ভৈরবানন্দের তখন তুরীয় অবস্থা। কঙ্কেতে এক সিকি গাঁজা পুরিয়া একটি প্রচণ্ড টানেই সে প্রায় তাহার বারো আনা পরিমাণ পোড়াইয়া ফেলিয়াছে এবং নাক-মুখের সমস্ত ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করিয়া মুদিত চোখে ধোঁয়াটাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে পাঠাইয়া ব্রহ্মমার্গ পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

বলি, ও দাদা, শুনছ ?

আহ্বানটা করুণ এবং মিনতিপূর্ণ ; কিন্তু ভৈরবানন্দের ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

ওহে ভায়া, শুনতে পাচ্ছ ?

অগ্রজ সম্বোধনে কাজ হয় নাই, কিন্তু ভায়া ডাকটা সার্থক হইল। মনে হইল, হঠাৎ যেন একটা গ্যাসের বোমা নিঃশব্দে ফাটিয়া গিয়াছে। পোড়া গাঁজার আকস্মিক বিকট দুর্গন্ধ আর পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য ভৈরবানন্দের দাড়িগোঁফজটাশোভিত বিরাট মাথাটিকে দৃষ্টির আড়াল করিয়া দিল। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়াটা স্বচ্ছ হইয়া আসিল এবং আগুন-রাঙানো কাঠকয়লার মত দুইটি অসন্তুষ্ট চোখ মেলিয়া ভৈরবানন্দ তাকাইল।

যে ডাকিতেছিল সেও সন্ন্যাসী, অর্থাৎ সন্ন্যাসীর বেশধারী। বয়স বেশি নয়, সুতরাং দাড়িটা এখনও তেমনই ভাবে উলুবনের মত যথেচ্ছ বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তবে দুই এক বছরের মধ্যেই বোধ হয় আর খেদ করিবার কারণ থাকিবে না। লোকটি সৌখিন, জটাগুলিকে সযত্নে মাথার উপর চূড়া করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

কি চাও ?

উত্তরে লোকটি অতিশয় মোলায়েম ধরণে হাসিল। গোঁফের আগাছার জঙ্গল ভেদ করিয়া ফাটা ঠোঁট জোড়া দুই ফাঁক হইয়া গেল এবং কোকেন খাওয়া কালো দাগে চিহ্নিত গজদন্তের মত দুইটি দাঁত উপরের পাটি হইতে উদ্ধতভাবে সামনে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সবটাই টেনে মেরে দেবে দাদা ? সামনে মা গঙ্গা বয়ে যাচ্ছেন, মহা পুণ্যির স্থান এই শ্মশানক্ষেত্তর, এখানে একাই ছিলিমটা পুড়িয়ে শেষ ক'রে দিও না। এই তো আমরা সাধু-সন্ন্যাসী ব'সে রয়েছি, আমাদের দান কর—পুণ্যি হবে, পুণ্যি হবে।

বলার ভঙ্গিতে ভৈরবানন্দ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কাকের মাংস কাকে খায় না বাপু, সন্ন্যাসীর আবার দান-পুণ্য কিসের ?

সে কথার উত্তর না দিয়াই লোকটি কহিল, এই তো দাদার হাসি ফুটেছে, একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং নয় তা হ'লে। মাইরি, যে ক'রে চোখ উলটে শিবনেত্তর হ'য়ে ব'সে ছিলে, তাতে যে দণ্ড তিনেকের মধ্যে মুখ খুলবে এমন ভরসাই ছিল না ; দাও তা হ'লে—একটান টেনেই নিই।

মনে কী যে ভাবান্তর ঘটিয়া গেল, কল্কেটা না বাড়াইয়া দিয়া ভৈরবানন্দ থাকিতে পারিল না। তারপর তেমনই হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে এখানে নতুন আমদানি দেখছি। কবে এলে, কোথেকে এলে ?

নবাগত কল্কেতে ভাল করিয়া ন্যাকড়াটা জড়াইয়া লইল এবং তারপর কষিয়া একটা টান মারিবার পূর্বক্ষণে এক চোখ বুজিয়া এবং আর একটা ঈষৎ ট্যারা করিয়া কহিল, বলছি, একটু দাঁড়াও।

আলাপটা সেই হইতে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সে দিনের গাঁজার ক্ষোভ ভৈরবানন্দের মিটিয়া গিয়াছে।

আসল কথা, নবাগত অর্থাৎ ভূমানন্দের অবস্থাটা বেশ সচ্ছল। কোথা হইতে সে যেন একটা শাঁসালো ভক্ত সংগ্রহ করিয়াছে, প্রত্যেক দিন সওয়া পাঁচ আনার গাঁজা সে গুরুকে নিবেদন করে, প্রসাদ পায়। পাটের বাজারে ফাট্‌কা খেলিয়া তাহার যাহা আয়, সে আয়ের যথাসর্বস্ব নেশা এবং আনুষঙ্গিকের পিছনে ব্যয় করিয়া উদ্বৃত্ত অংশটি সে গুরু-সেবায় নিয়োগ করে। শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেই, কেন কে বলিবে, হঠাৎ তাহার এই বিশাল বিশ্বসংসার এবং [illegible]-পরিবারকে নিতান্তই মায়াপ্রপঞ্চময় বলিয়া মনে হয়, গাঁজার ধোঁয়া মগজের মধ্যে যতই ঘন হইয়া জমিতে থাকে, ততই তাহার মানসিক বৈরাগ্য যেন সেই ধোঁয়ায় বেলুনের মত ফাঁপিয়া ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করিয়া চলে। বিকৃত কণ্ঠে সে শ্যামাসঙ্গীত জুড়িয়া দেয়—

'তোর খাঁড়ার ঘায়ে মায়ার বাঁধন
ঘুচিয়ে দে মা শ্মশানকালী—"

ভূমানন্দ খুশি হইয়া বলে, সাবাস বেটা, সাবাস। তোর হ'য়ে যাবে, এ যাত্রা তুই ত'রেই গেলি।

কিন্তু এটা উহাদের বাহিরের মুখোশ। সত্যকারের পরিচয়ের দিক হইতে কেহ কাহাকেও ঠকায় নাই, অসঙ্কোচে বিগত জীবনের ইতিহাস পরস্পরের সামনে মেলিয়া ধরিয়াছে। এবং সবচাইতে এইটাই বিস্ময়কর যে, দুইজনেরই অতীত কাহিনীর মূলে একটা বিশেষ বস্তু বিরাজ করিতেছে এবং সে বস্তুটি হইতেছে নারী।

ভৈরবানন্দ হঠাৎ যেন সমাধিস্থ অবস্থা হইতে জাগিয়া ওঠে। প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলে, তারা তারা! মেয়ে জাতকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই, ওরা সব পারে।

ভূমানন্দ মুখের উপর এমন একটা শ্মশানবৈরাগ্যের ভাব

টানিয়া আনে যে, এই মুহূর্তে তাহাকে দেখিলে ভুল হওয়াও বিচিত্র নয়।

বলে, শঙ্কর বলেছেন—নারী ছলনাময়ী, ত্রিভুবনকে ওরাই ছলনায় নাগপাশ দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

ইহাদের এই নারীবিদ্বেষ কিন্তু নিছক সন্ন্যাসব্রতের জন্যই নয়। কারণটা তা হইলে খুলিয়াই বলি।

ভূমানন্দের অবস্থা এককালে এ রকম ছিল না। তাহার আদি নাম বা পরিচয় এখানে ঘাঁটিয়া লাভ নাই, হয়তো-বা পুলিসে আমাকে লইয়াই টানাটানি করিবে। শুধু একটু বলিতে পারি, উত্তর-বঙ্গের এক বিখ্যাত জমিদার-বংশে তাহার জন্ম। দলে পড়িয়া তাহার পাখা গজাইল এবং অতি অবলীলাক্রমে দশ বৎসরের মধ্যেই জমিদারি আকণ্ঠ ঋণের চাপে মারোয়াড়ীর খেরো-খাতার কালো কালো অক্ষরের নীচে তলাইয়া গেল। ভূমানন্দের তাহাতে খেদ ছিল না, কিন্তু গোল বাধাইল—নারী।

অর্থাৎ জমিদারির বারো আনা পরিমাণ যে বিদ্যাধরীর সেবায় সে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, সে-ইই যখন দুর্দিনে তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাহারই দেওয়া হিল্‌ম্যানের গাড়িতে চাপিয়া এক ভাটিয়ার সঙ্গে লেকভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল, তখন ভূমানন্দের আর সহিল না। নির্জন গলিতে রাত্রিতে জানালা বাহিয়া সে ঘরে ঢুকিল এবং লম্বা ছুরিখানা এক দিকের বুকের কোমল মাংসপিণ্ডটাকে ভেদ করিয়া সোজা ফুসফুস পর্যন্ত চালাইয়া দিয়া পথে নামিয়া আসিল।

অতঃপর তাহাই শেষ পথ।

ভৈরবানন্দেরও প্রায় একই দশা। নমঃশূদ্রের ছেলে হইয়া সে গ্রামের এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পরিবারের কুমারী মেয়েকে বাহির করিয়া

আনিয়াছিল, কিন্তু বেশি দিন হজম করিতে পারিল না। মাসখানেক পরে একদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখিল, তাহার কাশীর বাড়ির চারদিকে পুলিস গিজ গিজ করিতেছে। অতএব উপায়ান্তর আর না দেখিয়া সামনে যাহাকে পাইল, তাহারই মাথায় একটা মদের বোতল চূর্ণ করিয়া সে অদৃশ্য হইল। লোকটা সেই আঘাতেই খুন হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহার সন্ধানে পুলিসের হুলিয়া গোটা দেশটাকেই যেন চষিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুদিন এদিক ওদিক গা-ঢাকা দিয়া থাকিয়া ভৈরবানন্দ দাড়ি-গোঁফ-জটাভারকে যথেচ্ছ বাড়িতে দিল, তারপর চার পয়সার গিরিমাটি কিনিয়া সমস্ত কাপড়-চোপড়গুলাকে রাঙাইয়া লইয়া এবং গায়ে প্রচুর ছাই মাখিয়া সে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটেই জাঁকিয়া বসিল।

এবং এইভাবে প্রায় অর্ধেক ভারতবর্ষটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত সে এখানে আসিয়াই জুটিল।

কিন্তু তারপর হইতে এই জীবনটাই ইহাদের সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। অতীতের কথা কখনও কখনও যদি বা স্বপ্নের মত হইয়া মনের সামনে ভাসিয়া ওঠে, কিন্তু তাহা লইয়া খুশি হওয়া ইহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে স্মৃতির সঙ্গে ফাঁসির দড়িটা এমন অবিচ্ছেদ্যভাবেই জড়াইয়া আছে যে, সেদিনের কথা স্মরণ করিলেও ইহারা শিহরিয়া ওঠে।

সন্ধ্যা হইয়া আসে। ওপারে চেতলার আলো দুই-একটি করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, আদি-গঙ্গার মন্থর জলে জোয়ারের চেতনা লাগে। একটু একটু করিয়া জল বাড়িতে থাকে, কাদা-মাখা তীর ছাপাইয়া জল একেবারে স্নানঘাটের ফাটা সিঁড়িটা স্পর্শ করে। হিন্দুর একান্ন পীঠের এক পীঠ, অদূরের ভারত-বিখ্যাত কালী-মন্দির হইতে আরতির বাজনা শুনিতে পাওয়া যায়।

তাহারই মধ্যে মিলিত একটা হরিধ্বনি যেন চারিদিকে সুর কাটিয়া দেয়।

ভৈরবানন্দ বলে, ওই এল আর একটা।

সেদিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া ভূমানন্দ জবাব দেয়, বুড়ো। এর জন্যে আবার এত ঘটা কেন রে বাবা?

তা ঘটা একটু বেশিই বটে। সঙ্গে লোকজন প্রচুর আসিয়াছে, যে পরিমাণ ফুল দিয়া তাহারা মড়া সাজাইয়া আনিয়াছে, তাহাতে সমস্ত ফুলের বাজারই নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার কথা। খোল করতাল লইয়া সেই যে তাণ্ডব তালে কীর্তন চলিতেছে তো চলিতেছেই।

কিন্তু কথাটা তাহা লইয়াই নয়।

আরও একটা মর্মান্তিক দৃশ্য সকলের চোখেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া বাজিতেছিল। বছর ষোল-সতরোর একটি মেয়ে, চোখের জলে তাহার সুশ্রী গাল দুইটি ভাসিয়া যাইতেছে, মাথার রুক্ষ চুলগুলি এলো-মেলোভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত গালে মুখে কপালে তাহার সিঁদুর লেপা, মৃতের পায়ের কাছে পাগলের মত মাথা কুটিতেছে।

এমন যে ভৈরবানন্দ, সে অবধি চোখ ফিরাইয়া আনে। একটা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া বলে, বুড়ো ঘাটের মড়ার প্রাণে এত রস! একটা কচি মেয়েকে পথে বসালে তো!

ভূমানন্দ হঠাৎ যেন কেমন বিকৃতভাবে হাসিয়া উঠে, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা! কিন্তু বুড়োর দোষ নেই ভায়া, নারী ছলনাময়ী—ছলনাময়ী!

তারপর অনেকক্ষণ দুইজনেই নিস্তব্ধ হইয়া থাকে; কী যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি উহাদের মনের উপর দিয়া অন্ধকারের মত বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ওদিকে এত আলো থাকিলেও এদিকটা অপেক্ষাকৃত ছায়াচ্ছন্ন। দুই-তিনটা চিতা হইতে পোড়া কাঠকয়লা এখনও সরানো

হয় নাই, তাহাদের চোখের সম্মুখে ধ্বংসাবশিষ্ট চিতাগুলির সে রিক্ত রূপ কেমন যেন খাপছাড়া দেখাইতেছিল।

ওদিকে আর একটা চিতা প্রায় নিবিয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে, কাঠকয়লার রাশি রাশি অঙ্গারের মধ্য হইতে দগ্ধাবশিষ্ট হাড়ের নিদর্শনস্বরূপ কয়েক টুকরা জমাট ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট আর কালো একটা কাঠের গুঁড়ির খানিকটা গাঢ় রক্তের মত আগুনের রঙে রঙিন হইয়া হিংস্রভাবে চাহিয়া আছে। মাথায় পাগড়ি আঁটিয়া কালো জোয়ান চেহারার একজন হিন্দুস্থানী লম্বা একটা বাঁশের সাহায্যে চিতার পোড়া কয়লাগুলি পরিষ্কার করিতেছে। কাঁচা কাঠ, বাঁশ আর পোড়া মাংসের পরিচিত একটা তীব্র গন্ধে জায়গাটা বিষাক্ত হইয়া আছে।

ভৈরবানন্দের যেন চটকা ভাঙিয়া যায়। একটা হাই তুলিয়া একান্ত উদাসীন কণ্ঠে বলে, নাঃ, মায়া, সব মায়া। সেই যে তুলসীদাস বলেছেন না? 'দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী'—

ওইখানেই তো আমাদের মিল, দাদা।

ভূমানন্দ আবার তেমনই অকারণেই হাসিয়া ওঠে। শ্মশানে মৃতের চারিদিকে খোল-করতালে নামসংকীর্তন চলিতেই থাকে, আদি-গঙ্গার জলে জোয়ারের অস্ফুট কলতান তাহার নীচে চাপা পড়িয়া যায়, কালী-মন্দিরের আরতির বাজনা ক্রমশ নিস্তব্ধ হইয়া আসে; ধুনির আগুনে দেওয়ালের গায়ে লেখা মৃতের অজস্র নামগুলি যেন অদ্ভুত রকমের জটিল হইয়া চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে; গঙ্গার ওপারে চেতলার ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া রাশি রাশি দেওয়ালি পোকা প্রদক্ষিণ করে; আর থাকিয়া থাকিয়া সেই মেয়েটির কান্না যেন কেমন একটা অস্বস্তির মত বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে।

ভূমানন্দের কথাটার জের টানিয়াই অনেকক্ষণ পরে ভৈরবানন্দ উত্তর দেয়, হুঁ, মেয়েমানুষ! বড় জটিল ব্যাপার ভায়া, কিচ্ছু বোঝবার জোটি নেই।

সুতরাং দুইজনের বন্ধুত্বই সুগভীর। নারীজাতির প্রবঞ্চনা সম্পর্কে তাহারা উভয়েই একটা সুচিন্তিত সমাধানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মানুষের চরিত্রগত অসামঞ্জস্য যেখানে যাহাই থাক, একটা বিশেষ ক্ষেত্রে তাহারা এমন নিভাঁজভাবেই মিলিয়া যায় যে, তখন সে অসামঞ্জস্যগুলিকে আর আলাদাভাবে খুঁজিয়া লওয়া চলে না।

অতএব বলিতে পারা যায়, স্ত্রীজাতির ছলনাকে ঘিরিয়াই তাহাদের এই বন্ধুত্বটা এমনভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

এবং, সে বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়াও এমন কিছু কঠিন নয়। বসিবার জায়গার অধিকার লইয়া একটা নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভূমানন্দের ঝগড়া বাধিয়া গেল। বাক্যবলে কুলাইল না তো বাহুবল আসিল। কুস্তি-করা ডাল-রুটি-চিবানো বিহারীর সঙ্গে নেশাখোর ক্ষীণপ্রাণ বাঙালীর পারিবার কথা নয়, ভূমানন্দকে কাঁধে তুলিয়া একটা আছাড় বসাইবার পূর্বক্ষণে ভৈরবানন্দ আসিয়া জুটিল; এবং ভূমানন্দ শুধু যে রক্ষা পাইল তাহা নয়, চিমটার ঘা খাইয়া কপালের রক্ত মুছিতে মুছিতে সেই রাত্রেই নাগা সন্ন্যাসী শ্মশানঘাট ছাড়িয়া সরিয়া পড়িল।

রাত বাড়িয়া চলে, জোয়ারের জল স্তিমিত হইয়া থম থম করিতে থাকে; এখনই ভাঁটার টান আসিবে। শুকতারাটা ঘুরিতে ঘুরিতে মাথার উপরে আসিয়াছে, ইলেকট্রিক লাইটের চারদিকে দেওয়ালি পোকারা মরিয়া মরিয়া প্রায় শেষ হইয়া গেল, শ্মশানের অবশিষ্ট চিতাটাও নিবিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে। অস্বাভাবিক নির্জন এই পৃথিবী, অস্বাভাবিক নির্জন এই শ্মশানঘাট। কোথাও কেহ নাই।

শুধু দূরে একটা দড়ির খাটিয়ার উপরে সেই হিন্দুস্থানীটা পড়িয়া পড়িয়া নাক ডাকাইতেছে।

আর শুধু জাগিয়া আছে ইহারা—এই দুইটি মাণিকজোড়। ঝুলির মধ্য হইতে ভূমানন্দ একটা বোতল বাহির করিল, কারণ করিবার এইটাই উপযুক্ত অবসর।

ভৈরবানন্দ তান্ত্রিক, অর্থাৎ তন্ত্রের কতকগুলো বীভৎস আচার-অনুষ্ঠানকে সে নিজের সঙ্গে অসঙ্কোচভাবে মিলাইয়া লইয়াছে। ভয়-লজ্জার প্রতিবন্ধক তো গৃহস্থাশ্রমেই লোপ পাইয়াছিল, ধর্মের আশ্রয় পাইয়া ঘৃণা জিনিসটাকেও সে ধুইয়া মুছিয়া বেমালুম সাফ করিয়া ফেলিয়াছে। এই অঘোরপন্থীরা না করিতে পারে এমন নোংরা অনুষ্ঠান পৃথিবীতে বিরল।

তাই মাটির পাত্রে ঢালিয়া দুই-এক চুমুক টানিবার পরে ভৈরবানন্দ কহিল, উঁহু, জুৎ হচ্ছে না ভায়া, চাট নেই। ভূমানন্দ হাসিয়া বলিল, এত রাত্রে তোমার জন্যে কে পাঁঠার কালিয়া নিয়ে ব'সে আছে বাপু?

দাঁড়াও।

টলিতে টলিতে ভৈরবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল, জলন্ত চিতাটার দিকে আগাইয়া গেল। তারপর মড়া ঠেলিবার পোড়া বাঁশ আর চিমটার সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুনের মধ্য হইতে কী একটা সাদা জিনিস লইয়া ফিরিয়া আসিল, কহিল, এই যে, চাট এনেছি।

ভূমানন্দ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

আরে, এ যে মড়ার খুলি!

হি হি করিয়া ভৈরবানন্দ হাসিতে লাগিল, কহিল তাতে কী হয়েছে, পুড়ে দিব্যি চানাচুর হ'য়ে আছে হে! মদের সঙ্গে জমবে চমৎকার। খেয়েই দেখ না এক কামড়।

বলিয়া খুলিটা মুখের মধ্যে এক গ্রাসে খানিকটা পুরিয়া দিয়া কড়মড় করিয়া চিবাইতে লাগিল। একটা চোখ বুজিয়া গদ্গদ কণ্ঠে কহিল, আহা হা, মহাশঙ্খ! সাক্ষাৎ অমৃত রে! এ রসে বঞ্চিত থাকতে নেই।

নেশা আকণ্ঠ না হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু ভূমানন্দও এ রসে বঞ্চিত রহিল না।

অশ্লীল একটা শব্দ করিয়া ভৈরবানন্দ প্রমত্ত স্বরে বলিল, এসব 'ম'কারে আর জোর নেই দাদা। এখন যদি একটা মেয়েমানুষ থাকত—

জড়াইয়া জড়াইয়া ভূমানন্দ জবাব দিল, উঁহু, উঁহু, আমি ওতে নেই। ভায়া—ওই 'ম'কারটাই মারাত্মক।

মাথার উপরে শুকতারাটা দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে—আদি-গঙ্গার মরা জল নিদ্রিত মহানগরীর অবচেতন পঙ্কিল চিন্তাধারার মত বহিয়া যাইতেছে। নিবিয়া-আসা চিতার শেষ আগুনের শিখায় ইহাদের শ্মশানচারী প্রেতের মতই বীভৎস মনে হইতেছিল।

এমনই করিয়া দিন চলিতেছিল। স্বভাবের দিক দিয়া অমিল অনেক আছে, মিলেরও অভাব নাই। খুঁটিনাটি বিরোধ একেবারে না বাধে এমনও নয়। কিন্তু সে বিরোধ যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি তাহার মূলও মনের মধ্যে বেশি দূর পর্যন্ত নিজেকে বাড়াইয়া দিয়া দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে না।

সেদিন কিন্তু দুইজনেরই টনক নড়িল!

একে গঙ্গার ঘাট, তার উপরে শ্মশান। মানুষের অন্ধ শ্রদ্ধা, তাই এখানে স্নানের জন্য ভিড় করিয়া আসে। জাহ্নবীর জলে স্নান করিবার পুণ্যটাই পরম লাভ, তাহার সঙ্গে মহাশ্মশানের যোগাযোগ ঘটিলে তো আর কথাই নাই।

সুতরাং এখানে সাধু সাজিয়া বসিয়া থাকা নিছক পারমার্থিক

নিষ্কাতর জন্যই নয়। নানা বয়সের বহু কিশোরী তরুণী বা যুবতী স্নান করিয়া অর্ধনগ্নভাবে জল হইতে উঠিয়া আসে, সেগুলি ফাউ; স্নান করিয়া যাইবার পথে দানের পুণ্য হিসাবে সাধু সন্ন্যাসীর দিকে অনেকেই দুই-একটা পয়সা ছুঁড়িয়া দিয়া যায়, প্রলোভনটা প্রধানত তাহারই।

এখানকার সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইহা লইয়া অনেক সময় রেষারেষি চলে। প্রত্যেকেই প্রাণপণ চেষ্টা করে, কেমন করিয়া অন্যের চাইতে নিজেকে বেশি পরিমাণে খাঁটি প্রমাণ করিবে।

ইহারা দুইজন বহুদিন যাবৎ একচ্ছত্র হইয়াই ছিল, কিন্তু কোথা হইতে সেদিন এক ভৈরবী আসিয়া হাজির।

ভৈরবীই বটে। চেহারা তাহার সুশ্রী না হইলেও সুগঠিত, মুখের উপরে অত বেশি পরিমাণে ছাই না মাখিলে বোধ হয় আরও একটু ভালো দেখাইত। দৃঢ় শরীরের গড়ন, অপচয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কপালে প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের ত্রিশূল আঁকিয়া আশেপাশে গোটা কয়েক মড়ার মাথা ছড়াইয়া লইয়া সে দিব্য জাঁকিয়া বসিল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন রাতারাতি ইহাদের কারবার ফেল পড়িয়া গেল।

ভিড়—ভৈরবীর চারিদিকে চব্বিশ ঘণ্টাই ভিড়। ভৈরবী সাধারণ স্ত্রীলোক নয়, সে স্বয়ং মা কালীর ডাকিনী-যোগিনীদের একজন। যাহার হাত দেখিয়া যে কথা সে বলিয়া দেয়, তাহাই যেন নির্ঘাত লাগিয়া যায় একেবারে, এতটুকুও ভুল নাই।

দাঁতে দাঁত চাপিয়া ভৈরবানন্দ বলে, তা তো নির্ঘাত লাগবেই, সোমত্ত বয়েস যে!

ভূমানন্দ চিমটা দিয়া ক্ষিপ্তের মত মাটিটা খুঁড়িতে থাকে, বলে, ওকে যে ক'রে হোক তাড়াও দাদা, এখানে ও মাগী আর দিন কয়েক থাকলেই আমাদের পাত্তাড়ি গুটিয়ে স'রে পড়তে হবে।

ভৈরবানন্দ দাঁতের পাটির মধ্য হইতে চিবাইয়া চিবাইয়া অস্ফুট স্বরে বলে, ইচ্ছা করে, ওর গলার মধ্যে সোজা ত্রিশূলটা চালিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে দিই।

উঁহু, ও কাজ করতে যেও না—পুলিসের হাঙ্গামাটা বড্ড খারাপ, ঠেকে শিখেছ তো।

পুলিস! তা সত্য। ভৈরবানন্দের মেজাজ শান্ত হইয়া আসে। পুলিসের বিভীষিকা এখনও তাহার যায় নাই। মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে তাহাদের স্বপ্ন দেখিয়া সে চমকাইয়া ওঠে। কাছাকাছি তাহাদের দুই-একজনকে দেখিলে এই পাঁচ বছর পরেও বুকের মধ্যে দুপ দুপ করিয়া যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতে থাকে।

ভূমানন্দ বলে, এমন একটা কিছু কর, যাতে এখানে টিকতে না পেরে তিন দিনেই সটকে যায়।

চিন্তিতভাবে ভৈরবানন্দ জবাব দেয়, তাই দেখতে হচ্ছে।

উদ্যোগপর্বে বেশি সময় নষ্ট হইবার কথা নয়। অতএব দুপুরের খর রৌদ্রে সমস্ত শ্মশান-ঘাটটাই যখন নির্জন হইয়া আসিয়াছে, তখন গলা-খাকারি দিয়া ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কী মনে ক'রে?

ভৈরবী ঝকঝকে দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিল, হাসিটা তাহার চমৎকার! কহিল, মায়ের স্থানে এসেছি, এতে আবার মনে করা-করির কি আছে?

ভূমানন্দ উগ্রস্বরে কহিল, আরে রেখে দাও তোমার মায়ের স্থান, ওসব ন্যাকামি ভালো লাগে না। ওই তো নিমতলা, কাশীমিত্তির, বরানগর রয়েছে, ওসব যায়গায় না গিয়ে এখানে মরতে এলে কেন?

এলুম, ইচ্ছে।—ভৈরবী তেমনি অকুণ্ঠিতভাবে হাসিল।

ভৈরবানন্দ ভৈরবস্বরে কহিল, না ওসব ইচ্ছে চলবে না এখানে। এখান থেকে যেতেই হবে তোমাকে।

যদি না যাই ?

বলছি, তোমাকে যেতেই হবে। নইলে—

নইলে মারবে নাকি ?—কৌতুকোজ্জল নির্ভীক চোখ তাহাদের দিকে মেলিয়া ধরিয়া ভৈরবী বিদ্রূপ করিয়া কহিল, আহা-হা, কী সব বীরপুরুষ রে ! দুটো ষাঁড়ের মত ষণ্ডা যোয়ান মিলে একটা মেয়েমানষের গায়ে হাত দিতে এসেছ, লজ্জা করল না ?

সত্যই এতক্ষণে লজ্জা করিল। তাহা ছাড়া ভৈরবীর হাসিতে এমন একটা বিচিত্র কিছু ছিল যে, ইহাদের মনের মধ্যে এতক্ষণের উদ্ধত উদ্দীপ্ত পৌরুষটা যেন ধূলাপড়া লাগিয়াই হঠাৎ নিস্তেজ হইয়া আসিল !

এমন কি ভৈরবানন্দ, ভূমানন্দ সেই প্রথম পরিচয়ের পর হইতে যাহাকে সচেতন অবস্থায় আর হাসিতে দেখে নাই, সে কিনা অনায়াসে সম্মুখের দাঁতের পাটিটা বিকশিত করিয়া ফেলিল ! আর ভূমানন্দ—চোখ দুইটা তাহার তীব্রভাবে জ্বলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সেটা ক্রোধে নয়, অন্য কারণে।

ভৈরবানন্দ কাশিয়া কহিল, আহা-হা, সে কি কথা, রাগ করছ কেন ? এসেছ, বেশ, থাকবে। সে তো ভাল কথাই। আমাদের তাতে আপত্তির কি আছে ?

ভূমানন্দ সঙ্গে সঙ্গেই খেই ধরিয়া কহিল, ওটা—ওটা, তোমাকে একটু ঠাট্টা, তা বুঝতে পারছ না ?

ভৈরবী বুঝিল এবং বুঝিল বলিয়াই রাগ করিল না। নিরুত্তরে খানিকটা হাসিল শুধু।

আদি-গঙ্গার জলে তেমনই জোয়ার-ভাঁটা খেলিয়া যায়, শ্মশানঘাট

নিত্য নূতন শববাত্রীর কোলাহলে আর হরিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া ওঠে, দেওয়ালের হোয়াইট-ওয়াশের উপর আরও কয়লার লেখা পড়িতে পড়িতে মৃতের নামগুলি আরও একটু অস্পষ্ট হইয়া আসে। ওপারে ইলেক্‌ট্রিক লাইটের চার পাশে ঘাসের উপরে সকালবেলা তেমনই করিয়াই অসংখ্য মৃত দেওয়ালি পোকা জমিয়া থাকে।

কিছুই বদলায় নাই, ইহাদের মনের মধ্যে কোথায় একটু একটু করিয়া বিচ্ছেদ ঘনাইয়া আসিতেছে শুধু। জোর করিয়া কেউ সেটা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে না, কিন্তু তাহার অস্বস্তিটা যেন পলে পলে অনুভব করা যায়।

ভূমানন্দের শিষ্যটি তেমনই করিয়াই গাঁজার অর্ঘ্য আনিয়া নিবেদন করে, ভূমানন্দ নিজে কয়েকটা সুখটান টানিয়া আবার কল্কেটা শিষ্যের দিকেই বাড়াইয়া দেয়। পাশে যে ভৈরবানন্দ অনেকক্ষণ হইতে তৃষিত চোখে চাহিয়া আছে, সেটা তাহার নজরেই আসে না।

ভৈরবানন্দ গাঁজার কল্কেটার গতিবিধি লক্ষ্য করে, কিন্তু কোন কথা বলে না। নীরবে তাহার চোখ উগ্র হইয়া উঠে, কি ক্ষুধিতভাবেই না ভূমানন্দ ভৈরবীর সর্বাঙ্গ দৃষ্টি দিয়া গ্রাস করিতে চাহিতেছে! ভৈরবানন্দের কঠিন হাতের মধ্যে চিমটাটা শক্ত হইয়া ওঠে, রক্তে রক্তে সে যেন ঝড়ের সঙ্কেত অনুভব করে। সেই যে কবে মদের বোতল বসাইয়া একটা মানুষের মাথা সে চুরমার করিয়া দিয়াছিল, রক্তের ছিটায় আর স্পিরিটের গন্ধে তাহার নাক মুখ চোখ ভরিয়া গিয়াছিল, সেই স্মৃতিটাই বার বার করিয়া মনের সামনে ভাসিয়া ওঠে।

আর ঠিক তাহাদের মুখোমুখি বসিয়া ভৈরবী অর্থপূর্ণভাবে হাসে, দুইজনের দিকে চাহিয়া লীলায়িত কটাক্ষ করে। বলে, কি গো

ঠাকুররা, অমন ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছ যে? কী দেখছ এত ক'রে?

ভূমানন্দ লজ্জা পাইয়া বলে, কই না।

কিন্তু ভৈরবানন্দের ধরণটা অপেক্ষাকৃত নির্বোধ হইলেও এ ক্ষেত্রে সে সপ্রতিভতার পরিচয় দেয়, ফস করিয়া বলে, দেখবার জিনিষ যে, দেখব না?

ভৈরবী মুখের একটা ভঙ্গি করিয়া বলে, ই—স!

ভূমানন্দ ভৈরবানন্দের দিকে কটমট করিয়া তাকায়।

মন্থর দিন, মন্থরতর রাত্রি। পিছনে মহানগরীর এমন গতি-চঞ্চল জীবন এখানে আসিয়া যেন শ্মশানের মৃত্যুর মধ্যেই ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। সেই একঘেয়ে দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি চলে। শুধু কাঁধে করিয়া যাহাদের বহিয়া আনা হয়, তাহারাই নূতন, অনুষ্ঠানটার কোথাও কোনও বৈচিত্র্য নাই।

সন্ধ্যার রঙ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হয়, তারপর রাত্রি বাড়ে। যেদিন মড়া আসে, সেদিন সারা রাত্রিই শ্মশান জাগিয়া থাকে। আর যেদিন আসে না, সেদিন গভীর রাত্রে যেন শ্মশানকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া মৃত্যু ঘুরিয়া বেড়ায়, যেন অশরীরী প্রেতাত্মাদের নিশ্বাসে গঙ্গার জল শঙ্কিত সঙ্কীর্ণ গতিতে বহিয়া চলে।

মধ্যরাত্রি। চারিদিকে অস্বাভাবিক নীরবতা, সামনে কেবল একটা গ্যাস-পোস্ট জ্বলিতেছে।

ভৈরবানন্দ উঠিয়া বসিল। কতদিন সে নারীসঙ্গ পায় নাই, অসংযত উপবাসী কামনা তাহার শিরাস্নায়ুগুলির মধ্যে যেন বিপ্লব চালাইতেছে।

এপাশে নেশার ঝোঁকে ভূমানন্দ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, আর ওধারে ভৈরবী অঘোরে ঘুমাইতেছে, তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ অবাধ যেন ভৈরবানন্দের কানে আসিতেছিল।

ভৈরবানন্দ হিংস্র একটা জানোয়ারের মত হামাগুড়ি দিয়া ভৈরবীর দিকে অগ্রসর হইল। ওই গ্যাসটা এখন যদি কেহ নিবাইয়া দিতে পারিত, বেশ হইত তাহা হইলে।

সমস্ত দেহের উপর আকস্মিক একটা ভারী চাপ পড়িয়া নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম, ভৈরবী রুদ্ধশ্বাসে আর্তনাদ করিয়া উঠিতে গেল, কে?

তাহার মুখে হাত চাপিয়া ভৈরবানন্দ বলিল, চুপ, আমি।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ভূমানন্দ সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল, বিকৃত বীভৎস স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, শা—লা, তোকে আমি খুন করব।

তারপর খুনোখুনি রক্তারক্তি পর্ব অনেক দূর পর্যন্ত যখন অগ্রসর হইয়াছে, তখন নিজের ঝুলি কাঁথাগুলি একসঙ্গে গুছাইয়া লইয়া ভিড় ঠেলিয়া ভৈরবী নিঃশব্দে অন্ধকার পথে নামিয়া গেল।

নারী—ছলনাময়ী। ইহাদের দুইজনকে যত সহজে কাছে টানিয়া আনিয়াছিল, তত সহজেই অবলীলাক্রমে আবার দূরে সরাইয়া দিল।

লুচির উপাখ্যান

সাদর অভ্যর্থনা করলেন ছাত্রের বাবাই। ঘোরতর বৈষয়িক এবং অত্যন্ত গম্ভীর মূর্তি লোকটি। আমার দিকে তাকিয়ে ভালো করে হাসেননি কখনো, ভালো করে কথাও বলেননি আমার সঙ্গে। কিন্তু আজ তাঁর প্রকাণ্ড গম্ভীর মুখে আড়াই যোজন হাসি দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। এমন অঘটনটা ঘটালো কে এবং কী উপায়ে?

—আসুন, আসুন মাষ্টার মশাই, বসুন। বিধু সিনেমায় গেছে।

মনে মনে আশান্বিত হয়ে উঠেছি। ছাত্র এবারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে, দু-একদিনের মধ্যেই ফল বেরুবার কথা। নিতান্ত নিরেট মস্তিষ্ক—তরে যাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ ছিল সে বিষয়ে। পুরো ছ' মাস গলদ্‌ঘর্ম হয়ে খাটতে হয়েছে। আমার সে আপ্রাণ পরিশ্রমটা তা হলে নিতান্তই বৃথা যায়নি, সহজ ও সঙ্গত ভাবে এই অনুমানটাই করে নিলাম।

—কোনো খবর আছে বিধুর?

—হ্যাঁ আছে।—ছাত্রের বাবা সিদ্ধেশ্বরবাবু তখনো হাসছেন।

—তা হলে পাশ করেছে তো?—তৃপ্তি আর আনন্দের উচ্ছ্বাসে মনটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। নিজে কোনো পরীক্ষায় পাশ করবার পরেও কখনো এতটা খুশি হয়ে উঠিনি: কোন্ ডিভিসনে গেল?

—কোন্ ডিভিসনে যাবে আবার?—সিদ্ধেশ্বরবাবু দুলে দুলে হাসতে

লাগলেন : পাশই করতে পারেনি। আপনি বিশ্বাস করেন রঞ্জনবাবু, আমার ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবে ?

নীল মেঘ থেকে বজ্রাঘাত। আমি নির্বোধের মতো হাঁ করে রইলাম। পঞ্চাশ টাকা করে মাসে মাসে আমাকে মাইনে দিয়েছেন সিদ্ধেশ্বরবাবু, অথচ বিধুকে শেষ পর্যন্ত পাশ করাতে পারলাম না। সিদ্ধেশ্বর খাঁটি ব্যবসাদার মানুষ; তেলের কল, আটার কল, আরো অসংখ্য কাজ-কারবারের মালিক। একটি পয়সা অপব্যয় করতে বুকের ভেতরটা চড়চড় করে ওঠে তাঁর। আর বিধু পাশ করতে পারেনি বলে সেই সিদ্ধেশ্বরবাবু অত্যন্ত খুশি হয়ে হাসছেন, অত্যন্ত প্রসন্নদৃষ্টি বর্ষণ করছেন আমার মুখের ওপর ? আচমকা মনে হল হয় আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নয় সিদ্ধেশ্বরবাবুর, নতুবা দুজনেরই।

আমার বিস্ফারিত বিহ্বলদৃষ্টি লক্ষ্য করে সিদ্ধেশ্বর এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। ভদ্রলোক রসিকতা করছেন নাতো আমার সঙ্গে ? নাকি ছেলে খুব ভালো করে পাশ করেছে বলেই আমাকে একটু বোকা বানিয়ে আমোদ করতে চান ? ধাঁধা লাগল। আজ তো পয়লা এপ্রিল নয়।

—সত্যি বলছেন ? পাশ করেনি ?

—না, না, না।—যেন ভারী একটা মজার ব্যাপার হয়েছে, এমনি কৌতুকোচ্ছল কণ্ঠে সিদ্ধেশ্বর বললেন, ভেতরে ভেতরে খবর নিলাম, একেবারে তিন তিনটে ঢ্যাড়া। আরে মশাই, আমিই দু'বারে ছাত্রবৃত্তি পাশ করতে পারিনি আর ও ব্যাটা এক চান্সেই ম্যাট্রিকুলেশন ডিঙ্গিয়ে যাবে ? ছাত্র কমে যাওয়ার ভয়েই না হেড্ মাষ্টার বছর বছর ওকে ক্লাশে

স্কুলে দিত? নইলে ওর ফিফ্থ ক্লাশের বিদ্যে আছে বলে মনে করেন নাকি আপনি?

তা অবশ্য আমি কোনোদিন মনে করিনি এবং এ বিষয়ে সিদ্ধেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমার কিছুমাত্র মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য এই যে ছেলে পাশ করতে পারেনি বলে তিনি আন্তরিক খুশি হয়েছেন এবং অতিশয় কৌতুক বোধ করছেন। নির্বাক বিস্ময়ে আমি ভাবতে লাগলাম কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার আছে নাকি এর ভেতরে? কোনো কম্‌প্লেক্স? নিজে পাশ করতে পারেননি, কাজেই ছেলেও ফেল করে বসেছে বলে মনে মনে খুশি হয়েছেন তিনি?

সিদ্ধেশ্বরবাবুর কণ্ঠে এবার সান্ত্বনার সুর লাগল: না, না, আপনি ঘাবড়ে যাবেন না মাষ্টার মশাই। আপনার ওপরে একটুও অনুযোগ নেই আমার। আপনি খুব খেটেছেন, আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সে তো নিজের চোখেই দেখেছি আমি। কিন্তু কী করা যাবে বলুন, ওর মগজে জিনিস না থাকলে পঁচিশ বছরেও কিছু হওয়ার নয়।

কিছু বলবার নেই। শুনে যেতে লাগলাম।

—এ ভালোই হয়েছে। পাশ করলেই কলেজে পড়তে চাইত। আর কলেজে একবার ঢুকলে ছেলেকে তখন পায় কে। না হক টাকার শ্রাদ্ধ। বাবু হয়ে যেতো, কতগুলো বখা ছেলের কাপ্তেন সেজে ঘুরে বেড়াত। বাপু, জাত-ব্যবসাদারের ছেলে তুই; ও সব নবাবী দিয়ে তোর হবে কী? এখন বরং বলতে পারব, মাস মাস পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মাষ্টার রেখে দিলাম, তবু পাশ করতে পারলিনে হতভাগা!

এতক্ষণে সিদ্ধেশ্বরবাবুর মনোভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে। ভাবলাম প্রতিবাদ করি, উচ্চশিক্ষার নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি খানিকটা। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরবাবুকে সে কথা বলা বৃথা। সিদ্ধিদাতা

গণেশের আশীর্বাদে খেরো খাতার কালো কালো অক্ষরগুলো ব্যাঙ্ক নোট হয়ে যাচ্ছে। স্বর্ণপদ্মাসীনা সরস্বতী মূর্তিমতী হয়ে বরদান করতে এলে সিদ্ধেশ্বরবাবু সোনার পদ্মটাই চেয়ে বসবেন, বাজারে আটাত্তর টাকা ভরি চলেছে আজকাল।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বরবাবুকে যেন নেশায় পেয়েছে। ছেলে ফেল করাতে মনের দরজাটা যেন আকস্মিক ভাবে খুলে গিয়েছে তাঁর। বুঝলাম আজকে বড় গোছের একটা দাঁও মেরেছেন তিনি, হয়তো নিরাপদে এবং নির্ঝঞ্ঝাটে হাজার কয়েক টাকা চলে এসেছে পকেটে। নইলে আমার মতো নিতান্ত একটা নৈতিক অপদার্থের সঙ্গে এতটা সময় তিনি অপব্যয় করছেন কী করে। লক্ষ্য করলাম: প্রকাণ্ড মুখে আড়াই যোজন হাসিটা সাড়ে তিন যোজনে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

টেলিফোনটা গুঞ্জন করছে। রিসিভার তুলে কানের কাছে ধরলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু।

—হ্যাঁ আমি। সিদ্ধেশ্বর। কে গোগেন নাকি? ওঃ ম্যাক্‌ফার্সন— হ্যাঁ? সাড়ে তিন শো? সাড়ে তিন শো তো? মন্দ হবেনা—ছেড়ে দিতে পারো। না, না, নাইন্‌টি টু পারসেন্ট্। হ্যাঁ তার কমে নয়। আচ্ছা ঠিক হবে।

কতগুলো সাংকেতিক বাক্য। কলেজে বার্কের বক্তৃতা পড়েছি, কার্লাইলের ফেনিল উচ্ছ্বাস পড়ে রোমাঞ্চিত হয়ে গেছি। কিন্তু এত কথা শিখেও মাষ্টারীর শূন্য হাঁড়িতে আরসোলার সুড়সুড়ি ছাড়া কিছুই নেই। আর মাত্র কয়েকটা সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যেই কুবেরের রত্নভাণ্ডারের রহস্য

সঙ্কেত—চিচিংকে ফাঁক করবার চাবিকাঠি। হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা।

টেলিফোন নামিয়ে সিদ্ধেশ্বর তেমনি হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমার দিকে তাকালেন। নিশ্চয় আরো কিছু ভালো খবর। ভাবলাম, রাস্কিন আর ম্যাথু আর্ণল্ড আজ এ দেশে জন্মালে নিশ্চয় এখন কালো বাজারে ব্যবসা করতে নেমে পড়তেন।

—দেখুন, কী লাভ পড়াশুনো করে? মারোয়াড়ীরা কিন্তু বলে ভালো। ছেলে দশ বছর লেখাপড়া না শিখে সেই সময়টা ব্যবসায় নামলে অন্তত ত্রিশ হাজার টাকা ঘরে আনবে। আর কেরাণী যদি রাখতে হয়, তা হলে পঁচিশ টাকা মাইনে দিলেই তো বাঙালী গ্রাজুয়েট এসে পা ধরে পড়ে থাকবে। এই তো মশাই লেখাপড়ার দৌড়—আর সরস্বতীর আশীর্বাদের পরিণাম।

অকাট্য যুক্তি। দীনতায় মাথা নীচু করে রইলাম। হায়, স্কুলে পড়বার সময় কেন আমার সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরবাবুর দেখা হল না! তা হলে এতদিনে সিদ্ধিদাতার পদরজঃ কি যৎকিঞ্চিৎও সঞ্চয় করতে পারতাম না? জীবনের এতগুলো বছর নিতান্তই বৃথা গেল।

বললাম, ঠিকই বলেছেন।

—এই দেখুন তা হলে, দেখুন—অপরিমিত খুসি হয়ে উঠলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু: টাকাই সব মশাই, টাকাই সব। নইলে আমার মতো গোমুখ্যু আপনার মতো একজন এম, এ, পাশকে ছেলের মাষ্টার রাখতে সাহস পাই কখনো? জীবনে উন্নতি চান তো ব্যবসা ধরুন রঞ্জনবাবু। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী—আপনাকেও কি বলে দিতে হবে?

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, কী ব্যবসা করব?

—কী ব্যবসা করবেন?—হঠাৎ যেন জ্বলে গেলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু,

চোখ মুখ এক সঙ্গে শাণিত হয়ে উঠল। ঠিক এই মুহূর্তে আমি যেন তাঁর প্রকৃত চেহারাটা দেখতে পেলাম।

মেঘমন্দ্রস্বরে সিদ্ধেশ্বর বললেন, ব্যবসা? যা ধরবেন তাই ব্যবসা। ধুলোকেও সোনা করা যায়, কাঁকরকেও টাকা করা চলে। আজ আপনাকে একটা গোপন কথা বলব রঞ্জনবাবু। বিশ্বাস করা হয়তো শক্ত, কিন্তু প্রত্যেকদিনই আপনারা তার পরিচয় পাচ্ছেন।

সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তার আগে একটু চা করতে বলে আসি। আপনাদের মতো লোকের সঙ্গে তো আলাপ-আলোচনার সৌভাগ্য আমাদের হয় না, তাই আজ একটু মন খুলে গল্প করব। আপনি বসুন।

চটির শব্দ করে তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

চুপ করে বসে আছি। সিদ্ধেশ্বরবাবুর কথাগুলো নতুন নয়, এমন উপদেশ আরো অনেকের কাছে শুনেছি, অনেকবারই শুনেছি। কম্বল মাত্র সম্বল করে জেঠুমল আগরওয়ালা কলকাতায় পাঁচ পাঁচখানা বাড়ী ফেঁদেছে। এক গদীর সাতজন মারোয়াড়ী বাইরে বেরুতে হলে এক জোড়া জুতো দিয়েই কাজ চালায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র থেকে নিস্তারিণী কেবিনের রসিকমামা পর্যন্ত সকলেই সে সব রোমাঞ্চকর কাহিনী হাজার বার শুনিয়ে দিয়েছেন। তার জন্যে কোনো আগ্রহ নেই, কিন্তু কী গোপন কথা আমাকে বলবেন সিদ্ধেশ্বরবাবু! সোনা তৈরীর মন্ত্র? বিনা খরচায় বড়লোক হওয়ার উপায়? ফাঁকতালে কিছু যদি হয়ে যায় তো মন্দ কী। হাতে এখন কোনো কাজ নেই, তাই অলস কৌতূহলে বসে বসে সিদ্ধেশ্বরবাবুর প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

কলকাতার উত্তর পূর্বাঞ্চল। একটু দূরেই মানিকতলার খাল। বড় বড় বাড়ীগুলোর সঙ্গে কাঠের খাঁচা আর অসংলগ্ন বস্তির বিচিত্র

সংমিশ্রণ এখানে। রেডিয়োর গানের সঙ্গে ঐকতান জমায় পাশের তেলের কল থেকে ছন্দোহীন কর্কশ কোলাহল। দূরে সার্কুলার রোড থেকে ট্রামের শব্দ আসে, আর এখানে খোয়া-ওঠা পাথুরে রাস্তায় খট খট করে চলে মাল বোঝাই গোরুর গাড়ি। সিনেমা হাউসে আলোর দীপালি জ্বলে, আর বস্তির ভেতরে কেরোসিনের ম্লান রক্তশিখায় বংশচন্দ্র অধিকারীর দলের 'দক্ষযজ্ঞ' গীতাভিনয়।

এ একটা অপূর্ব জগৎ। পূর্ণ আর ভগ্নাংশে অচ্ছেদ্য বন্ধনে গলাগলি করে আছে। কালিমাখা কলের মানুষ আর ধোপদুরস্ত নাগরিক। সন্ধ্যায় প্রজাপতি সেজে মেয়েরা রিক্সা চেপে সিনেমায় যায়, আবার কেউ কেউ রূপোর গয়না পরা কালো কালো হাতে মেটে দেওয়ালে ঘুঁটে থাবড়ায় তখনো। আর সকলের মাথার উপরে চূড়ো তুলে জেগে আছে পরেশনাথের মন্দির। রাজবৈভব ঐশ্বর্য-বৈরাগী মহাপ্রাণ জৈন তীর্থংকরদের আবার রাজপ্রাসাদে এনে বসিয়েছে কুবেরের বরপুত্রেরা। ত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্যে ব্যয়িত বিপুল অর্থের অভ্রভেদী চূড়া নিশ্চয়ই বস্তির নিরন্ন মানুষগুলোকে ত্যাগ আর বৈরাগ্যের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করছে।

চটকা ভেঙে গেল। তেমনি চটির শব্দ করে সিদ্ধেশ্বর ঘরে এসেছেন। চেয়ারটাতে বসে পড়ে এবার তিনি সাড়ে চার যোজন হাসি হাসলেন। বললেন, কী ভাবছিলেন?

—আপনার কথাগুলোই।

ভারী আপ্যায়িত হয়ে গেলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। বললেন, ভাববার কথাই। আচ্ছা মাষ্টারমশাই, আন্দাজ করুন তো, যুদ্ধের বাজারে কত টাকা কামিয়েছি আমি।

কঠিন প্রশ্ন। তবু আন্দাজে বললাম, দশ লাখ?

—একটু বাড়িয়ে বলেছেন—সোনাবাঁধানো দাঁতগুলো মাড়ি পর্যন্ত

উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। বললেন: অত নয়, কিছু কম। কিন্তু সে যাক। বলছিলাম, ব্যবসা করুন। ইচ্ছা থাকলে কাঁকর দিয়েও ব্যবসা জমানো চলে।

—কাঁকর?

—হ্যাঁ—বিশুদ্ধ কাঁকর। ধান নয়, চাল নয়—অকেজো কচ্‌কচে কাঁকর। আর এই কাঁকরের টাকাতেই দমদমে আমি দুখানা নতুন বাড়ি কিনেছি—বিশ্বাস করেন আপনি?

বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে আমি বললাম, কাঁকরের টাকাতে?

—বিশ্বাস করা শক্ত? কিন্তু আমি বলছি, এতটুকু অতিরঞ্জন নেই এতে, মিথ্যে নেই এতটুকু। আপনাকে মিথ্যে বলে আমার লাভ কী?

—কিন্তু—

—সবটা বলি শুনুন, ব্যস্ত হবেন না—সিদ্ধেশ্বর চেয়ারটাকে আমার আরো কাছে টেনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন: প্রথম যখন কন্ট্রাক্ট পেলাম, আমার নিজেরই বিশ্বাস হয়নি ব্যাপারটা। তারপরে দেখলাম এর মধ্যে জটিলতা নেই একবিন্দুও, সব কিছুই জলবৎ তরলম্।

—কী রকম?

পরেশনাথের মন্দিরের উদ্ধত চূড়োটার দিকে তাকালেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। অন্যমনস্কভাবে বিড়ি ধরালেন একটা।

—কাঁকরের ফরমাস যারা দিয়েছিল তাদের নাম করব না। কিন্তু যে দাম তারা দিতে চাইল তাতে মনে হল যুদ্ধের বাজারে আর সব জিনিসই সোনা হয়ে গেছে—এক মানুষের প্রাণ ছাড়া। প্রচুর কাঁকরের অর্ডার তারা দিয়েছিল—পাঁচ মণ, দশ মণ, পাঁচশো মণ। কেন জানেন?

—বলুন।

—চালে মেশাবার জন্যে।

আমি একটা অস্ফুট শব্দ করলাম।

সিদ্ধেশ্বর বিড়িটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, না, না, চমকাবেন না। ভাতে যে কাঁকর আপনারা খান, তা নিতান্তই অ্যাক্সিডেণ্ট্ নয়, বাড়তি ফসলের মতো ধান ক্ষেত থেকে উঠেও আসেনি। বহু খরচ করে লরী বোঝাই দিয়ে তা আমদানী করতে হয়েছে, অনেক হিসেব করে, অনেক যত্ন করে তাকে চালের সঙ্গে মিশাল দিতে হয়েছে। ভগবানের কোনো কাজ-কারবার নেই এখানে, মানুষের কেরামতিই ষোলো আনা।

আমি বোকার মতো বললাম: কী অন্যায়। এতো জোচ্চুরি। আপনি সাপ্লাই দিলেন কাঁকরের?

—নিশ্চয় দিলাম। কেন দেব না? ব্যবসা—ব্যবসাই। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্টির সেজে কোন্ ব্যাটা বসে আছে? আর আপনি জোচ্চুরি বলছেন কাকে? আপনাদের ওই এক দোষ মাষ্টারমশাই, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের গোপাল বড় সুবোধ বালক ছাড়া কিছুই আর শিখলেন না।

—তাই বলে মুখের গ্রাসে—

—মুখের গ্রাসে!—সিদ্ধেশ্বরবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: কিসে ভেজাল নেই বলতে পারেন? তেলে, আটায়, ঘিয়ে, ডালে। আটার ভেতরে মুঠো মুঠো ধুলো। ধুলোর দর কত জানেন?

—না, জানি না।

—জানা উচিত ছিল। প্রথম ভাগ-পড়া মনটাকে একটু ঝালিয়ে নিন রঞ্জনবাবু। এ যুদ্ধের সময়। যা গুছিয়ে নিতে হয় এইবেলা। কাঁকর থেকেও যদি সোনার দানা কুড়িয়ে নেওয়া যায়, তা হলে সে সুযোগ কে ছাড়ে বলুন?

—কত মণ কাঁকর সাপ্লাই দিয়েছেন আপনি?

—তার কি ঠিক আছে কিছু?—সোনাবাঁধানো দাঁতগুলো আবার

ঝলক দিয়ে উঠল : হাজার হাজার মণ। নৌকোয় বোঝাই হয়ে এসেছে, লরীতে বোঝাই হয়ে এসেছে, তারপর চালের সঙ্গে মিশে গেছে কলকাতার দোকানে দোকানে, গেছে বাংলাদেশের সহরে গ্রামে। এক মণ চালের সঙ্গে তিন সের কাঁকর গৃহস্থের পেট ভরিয়েছে, ব্যবসায়ীর পকেট ভরিয়েছে।

—গৃহস্থের পেট ভরিয়েছে ?

—ভরায়নি ? চাল সহজেই হজম হয়ে যায়, একটু পরেই ক্ষিদে পায় আবার। কিন্তু কাঁকর সে বান্দাই নয়। একবার ঢুকল তো বসে রইল পাকাপোক্ত কায়েমি বন্দোবস্ত করে। ক্ষিদে পাবে কি, তখন পেটের ভারেই লোককে ছটফট করতে হয়।

আর একটি মূল্যবান যুক্তি। কিন্তু আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালাম সিদ্ধেশ্বরবাবুর মুখের দিকে। ঠাট্টা করছেন না তো ভদ্রলোক ?

না, ঠাট্টা নয়। সিদ্ধেশ্বর আবার বললেন, তাছাড়া দেশে চাল কম। যা আছে তাও তো মাটির নীচে—মানে চোরাবাজারে। এই কাঁকর দেওয়ার ফলে দেখুন তার পরিমাণ বেড়ে গেল কতখানি। তা' ছাড়া পেটে ভার পড়াতে লোকেরও ক্ষিদে মরে গেল, দু'দিক থেকেই চমৎকার সাশ্রয় হল। আপনিই ভেবে দেখুন।

আমি আর ভেবে দেখব কী ? আমার চাইতে ঢের বেশী ভেবে রেখেছেন সিদ্ধেশ্বর। ডিম্যাণ্ড অ্যাণ্ড সাপ্লাই নীতির এই অপূর্ব ব্যাখ্যা মল্লিনাথ পর্যন্ত করতে পারতেন না।

টেবিলের ওপরে টেলিফোনটা আবার সাড়া দিয়ে উঠছে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে সিদ্ধেশ্বর রিসিভার কানে তুলে নিলেন। সেই সাংকেতিক শব্দের বিনিময়। রত্নভাণ্ডারের দরজা খোলবার সেই অক্ষয়মন্ত্র।

ফোন নামিয়ে সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, তাই বলছিলাম মাষ্টারমশাই। যা ধরবেন তাই সোনা হয়ে যাবে—ব্যবসায় নেমে পড়ুন। কাঁকর, ধুলো,

সোরগুজা, চর্বি। কিছুই ফেলা যায় না, এক বছরের মধ্যে তা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।

হঠাৎ একটা মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল ঘরটা। চাকর দু'থালা মনোরম আর ধূমায়মান ফুল্‌কো লুচি নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। তিন চার রকমের মিষ্টি, ডাল, আলুর দম। ছাত্রকে ফেল করাবার পরে প্রাইভেট টিউটরের এমন অভ্যর্থনা ইতিহাসে লেখে না।

বিনয়ে গলে গিয়ে সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, আসুন মাষ্টারমশাই, একটু চা খান। গরীবের বাড়ীতে যৎসামান্য—

মুহূর্তে লুচির ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। টাটকা ঘিয়ের এমন চমৎকার লুচি কতদিন খাইনি। দেখতে দেখতে থালা খালি হয়ে গেল। নাঃ—সিদ্ধেশ্বরবাবুর লুচিতে কাঁকর নেই, ময়দায় বালি নেই; কাঁকরের বিনিময়ে বাজারের সেরা জিনিস তিনি সংগ্রহ করেছেন।

রাস্তায় যখন নেমে পড়লাম, তখন পেছনে পেছনে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন সিদ্ধেশ্বরবাবু।

—বড় আনন্দ হল মাষ্টারমশাই আপনার সঙ্গে আলাপ করে। আমরা দোকানদারীই করি, আপনাদের মতো পণ্ডিত লোকের সঙ্গ পাওয়ার সুযোগ-সুবিধে তো হয় না।

ভারী সদালাপী ভদ্রলোক। এবারে আপ্যায়িত হওয়ার পালা আমারই। বললাম না, না আমারই বড্ড উপকার হল। আমরা নিতান্তই মাষ্টার, প্র্যাক্‌টিক্যাল কাজের কথা আর ক'জনের কাছে শুনতে পাই বলুন?

প্রত্যুত্তরে এবার পুরো পাঁচ যোজন পরিমিত হাসি হাসলেন সিদ্ধেশ্বর-বাবু: কী যে বলেন।

দু'পা এগিয়েছি, হঠাৎ পাশের বস্তির ভেতরে মড়াকান্নার আকুল শব্দ। থমকে থেমে গেলাম '

সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, ও কিছু নয়, বস্তিতে কলেরা লেগেছে। একটু সাবধান থাকবেন মাষ্টার মশাই. টিকে নিয়েছেন তো ?

হন হন করে চলতে সুরু করেছি। কিন্তু একটা মোড় ঘুরেই আবার থেমে পড়তে হল। কণ্ট্রোলের দোকান। ছোট রাস্তা প্রায় সম্পূর্ণ জুড়ে 'কিউ' করেছে বস্তির দরিদ্র নরনারীর দল। চালের জন্যে, আটার জন্যে, আর হয়তো সিদ্ধেশ্বরবাবুর ধূলো-বালি -কাঁকরের জন্যে। ওদিকে বস্তিতে কলেরা লেগেছে—এখান থেকেও শুনতে পাচ্ছি মড়াকান্না।

হঠাৎ গলার মধ্যে লুচির একটা তীব্র ঢেঁকুর উঠল। আর চোখে পড়ল পরেশনাথের মন্দিরের একটা উদ্ধত চূড়ো বস্তির মাথার উপরে সগৌরবে শোভা পাচ্ছে। আচমকা একটা খেয়ালের বশেই আমার মনে হল : ওই মন্দিরটা ভেঙে ফেললে কত মণ কাঁকর বেরুতে পারে ?

পাণ্ডুলিপি

ষ্টেশনের বাইরে নিম গাছের নিচে গোরুর গাড়িখানা রেখে তারাকান্ত প্ল্যাটফর্মে এসে ঢুকলেন।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। আকাশে অসংখ্য তারার রক্তাভ রঙ দেখতে দেখতে বিবর্ণ হয়ে গেল। ফিকে অন্ধকারের ভেতর টুপটুপ করে শিশির পড়ছে, ষ্টেশনের ঠিক সামনেকার বড় আলোটা একটু পরেই নিবে যাবে হয়তো।

তারাকান্ত পকেট থেকে চেনে বাঁধা সোণার ঘড়িটা বের করে সময়টা দেখে নিলেন। রাত সাড়ে চারটে। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস আসতে ছ'ঘণ্টা দেরী আছে এখনো।

একটু বেশি তাড়াতাড়িই এসে পৌঁছেছেন তারাকান্ত। তা হোক। বারো মাইল পথ—গোরুর গাড়ীকে বিশ্বাস নেই। সময়মতো পৌঁছুতে না পারলে বিলক্ষণ কষ্ট হবে বিভূতির। যা ষ্টেশন—কতগুলো তেলেভাজা জিলিপি আর ছ'মাসের পুরাণো একরাশ জিভেগজা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না এখানে। আর চা! তার স্বাদ, গন্ধ এবং বর্ণের কথা না ভাবাই ভালো।

চায়ের কথা মনে পড়তেই তারাকান্ত চকিত হয়ে উঠলেন :

—কৈলেস, বলি ও কৈলেস?

বলদ দুটোকে পোয়াল নামিয়ে দিতে দিতে কৈলাস সাড়া দিলে, আজ্ঞে?

—টিফিন-বাস্কেট, স্টোভ ঠিক আছে তো সব ?

—আজ্ঞে হাঁ, আছে বই কি।

যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ট্রেণ আসবার দশ মিনিট আগে চায়ের জলটা চাপিয়ে দিলেই চলবে। তা ছাড়া ডিম আছে, লুচি, আলুভাজার বন্দোবস্ত আছে, কিছু ভালো টাটকা কাঁচাগোল্লাও সঙ্গে আনতে তারাকান্ত ভুল করেননি।

মোটা একটা চুরুট ধরিয়ে তারাকান্ত কাঁকর বিছানো প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপর পায়চারী করতে লাগলেন। আফিস ঘরের কাঁচের দরজার ভেতর দিয়ে বাইরে অল্প অল্প আলো পড়েছে, যাঁর ডিউটি, তিনি নিশ্চিন্তে সুখস্বপ্ন দেখছেন বোধ করি। পৃথিবীর এখনো জাগবার সময় হয় নি, অথচ চারদিকে একটা তরল প্রশান্তি, যেন জাগরণের পূর্বাভাসে তার নিশ্বাস অবধি লঘু হয়ে আসছে। শান্ত নিস্তব্ধতার ভেতর কেবল ভেসে আসছে বন-ধুতুরোর একটা মাদক-গন্ধ, আর তারাকান্তের ভারী জুতোটার সঙ্গে কাঁকরের একটা কর্কশ মিশ্রধ্বনি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। প্ল্যাট্‌ফর্ম-ল্যাম্পের আলো পিছলে পড়ে রেল লাইনের ঘষা ইস্পাত যেন রুপোর মতো চিকচিক করছিল।

কতদিন পরে বিভূতি আসবে। বিভূতি, তারাকান্তের নিজের হাতে গড়া বিভূতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাতে সোণার মেডেল পেয়ে সে দেশে ফিরছে। তারাকান্তের সমস্ত স্বপ্ন এতদিনে সার্থক, সমস্ত কল্পনা বাস্তবের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার সিদ্ধিলাভ করেছে। এ সাফল্যের গৌরব বিভূতির খালি একারই নয়।

অথচ, মামার বাড়ীতেই মা-মরা ছেলেটা মানুষ হয়ে চলছিল। গ্রামের টোলে ব্যাকরণের আদ্য অবধি পাশ করেই যখন সে পৈতৃক যজমানী ব্যবসা সুরু করে দিয়েছে, এমনি সময় তারাকান্ত তাকে নিজের কাছে

টেনে নিয়ে এলেন। তাঁর বিপত্নীক নিঃসন্তান জীবনে দূর-সম্পর্কের এই ভাইপোটিই হয়ে দাঁড়াল একমাত্র সান্ত্বনা এবং অবলম্বন।

শোনা যায় যৌবনে তারাকান্ত অ্যানার্কিষ্ট বলে পরিচিত ছিলেন। এটা ইতিহাস অথবা কিংবদন্তী আজকে তা যাচাই করে নেবার উপায় নেই। কিন্তু অতীতের মানুষ হয়েও তাঁর মন একটা বিচিত্র ব্যাপকতায় কেমন করে যেন বর্তমানকে স্বীকার করে নিয়েছে। তারাকান্তের চরিত্রে এটা বিস্ময়কর বিশেষত্ব; পঞ্চাশোর্ধে তিনি আধুনিক।

পেশল দু'খানি শক্তিশালী পায়ের ছন্দোবদ্ধ আঘাতে সজাগ হয়ে উঠল সমস্ত প্ল্যাট্‌ফর্ম। যৌবন: কোথায় গেল যৌবনের সে সমস্ত আশা—সেদিনের প্রসারিত দৃষ্টির সামনে বর্ণোজ্জ্বল স্বর্ণদিগন্ত। গতানুগতিকতার চাপে তারাকান্তের বহির্মুখী মনটা বাধ্য হয়ে ফিরে এল নিজের নির্ধারিত গণ্ডিটারই মাঝখানে। তারপরে দৈনন্দিন জীবন, জমিদারীর অসংখ্য জটিলতা এবং সাংসারিকতার চিরন্তন সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ইতিকথা।

স্বপ্নভঙ্গের আঘাত তারাকান্তের সমস্ত জীবনটাকেই ব্যথায় বিষাক্ত করে দিয়েছিল। সাধারণ, অতি সাধারণের সঙ্গে বেঁচে থাকবার পূর্বানুবৃত্তি। সবাই যেমন করে বাঁচে, সবাই যেমন করে মরে। লক্ষকোটি জল-বুদ্‌বুদের ভেতর আর একটি। যাচাই করা যায় না, বাছাই করা যায় না, অবশ্যম্ভাবী ক্ষণভঙ্গুরতায় সকলের দৃষ্টির সামনে থেকে একদিন যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে। কবে একদিন সূর্যের আলো ইন্দ্রধনুর সাতটি রঙে তাকে রাঙিয়ে দিয়েছিল, সে ইতিহাস সেদিন কে জানে?

কিন্তু তারপরেই এল বিভূতি। না, এল বললে কম বলা হয়, বলতে হয় আবির্ভাব। অদ্ভুত বুদ্ধি, আশ্চর্য প্রতিভা। ফটোগ্রাফির কাঁচের মতো তার মন, তারাকান্ত ভাবলেন তাঁর নিজের সমস্ত ভাবনাকে, সমগ্র

অনাগত ভবিষ্যৎকে সেই কাঁচের ওপর ফুটিয়ে তুলবেন। বিভূতির স্বচ্ছ বুদ্ধি ও প্রতিভার পটভূমিকায় তারাকান্ত এঁকে চললেন নিজের প্রতিকৃতি। কিন্তু মাথায় রইল তার মুকুট, চোখে রইল আলো আর হাতে রইল রাজদণ্ড; বিভূতির ভেতর দিয়ে তারাকান্ত নতুন করে নিজেকে রচনা করলেন।

বারো বৎসর আগেকার কথা, অথচ মনে হয় যেন সেদিন। তারাকান্তের দৃষ্টির সামনে সে সব ছবির মতো ভাসছে। বাইরে মলিন সন্ধ্যা। ঘরের ভেতর লণ্ঠনের আলো। কাঁচের আলমারীতে তারাকান্তের ইতিহাস আর রাজনীতির মরক্কো বাঁধানো মোটা মোটা বইগুলো ঝকমক করছে।

—তারপর পিটার দি গ্রেট কী করলেন কাকামণি?

—তারপর, তারপর পিটার দি গ্রেট সমস্ত দেশটাকে নতুন করে গড়ে তোলবার কাজে মন দিলেন। সমাজে কত সব বিশ্রী নিয়মকানুন ছিল, পিটার আইন করে দিলেন, সে সব যারা মানবে, কঠিন শাস্তি হবে তাদের। দেশের অশিক্ষিত বোকা লোকগুলো পিটারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইল, আর এই বিদ্রোহীদের নেতা হলেন কে জানো? তিনি পিটারের নিজের ছেলে যুবরাজ আলেক্সিস।

বিভূতি ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, ভারী দুষ্টু ছেলে তো।

—তা বৈকি। কিন্তু তাই বলে পিটার ছেলের অন্যায়টাকে ক্ষমা করলেন না। রাজ্যের অন্যান্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে তিনি আলেক্সিসেরও প্রাণদণ্ড দিলেন।

বিভূতি রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, প্রাণদণ্ড দিলেন?

—নিশ্চয়ই দিলেন। যাঁরা বড়লোক, তাঁদের এমনি করেই ন্যায় বিচার করতে হয় যে। নইলে লোকেই বা তাঁদের মানবে কেন? আমাদের

দেশেও একজন বড় রাজা এইরকম কাজ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন মহারাজ রামপাল। ছেলে রক্ষপালের একটা মস্ত অপরাধে তিনি তাকে শূলে চড়িয়ে মেরে ফেলেন।

এমনি করে দিনের পর দিন অক্লান্ত চেষ্টায় তারাকান্ত বিভূতিকে গড়ে তুলেছেন। রাশিয়া কোথায়, কাইজার কে, মহাত্মা গান্ধী কি করেছেন, নায়াগ্রা প্রপাত আবিষ্কার করতে মানুষ কেমন করে এগিয়ে চলেছে সহস্র বিপদের মধ্যে, হিমালয় অভিযানে কেমন করে দুঃসাহসী মানুষ স্বেচ্ছায় মরণকে বরণ করে এনেছে।

তারপর বিভূতি বড় হয়ে উঠল, কুড়ি টাকার একটা বৃত্তি পেল ম্যাট্রিকুলেশনে। পাবেই—এ যেন তারাকান্ত একটা জন্মগত সংস্কারের ভেতর দিয়ে জানতেন। তাঁর এত কল্পনাকে বিভূতি মিথ্যে করতে পারে না কখনো। যেমন করে গড়ে উঠেছে য়্যাব্রাহাম লিঙ্কন্ আর জর্জ ওয়াশিংটনের জীবন, গ্যারিবল্ডী, ম্যাট্‌সিনি আর মুসোলিনীর সার্থকতা, কাভুর আর বিস্‌মার্কের ভবিষ্যৎ, ঠিক তেমনিভাবে বিভূতিকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন তারাকান্ত। সাধারণের মাঝখানে সে মাথা তুলে দাঁড়াবে অনন্যসাধারণ হয়ে, নিজেকে সে কেবল একটা বুদ্বুদের মতোই নিশ্চিহ্ন করে দেবে না; বাঁচা-মরার একটানা স্রোতে সে বয়ে আনবে প্রাণবন্যা—বিভূতির মধ্যে হয়তো আরো একটা বৃহত্তর সত্তাকে তিনি আবিষ্কার করবেন যা তাঁর নিজের মনোজগতেরও বাইরে ছিল।......

আকাশে ভোরের রঙ। প্ল্যাট্‌ফর্মের বড় আলোটা এই মাত্র দপ করে নিবে গেল। পোড়া কেরোসিনের একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বন-ধুত্‌রোর গন্ধ উগ্রতর হয়ে আসছে।

বিভূতি—ক্যানভাসের ওপর আঁকা তারাকান্তের নিজের নিখুঁত প্রতিমূর্তি। অথবা শাদা কাগজে লেখা একটা আত্মকাহিনী। ঠিক

আত্মকাহিনী নয়। সেখানে ব্যর্থতা নেই, স্বপ্নভঙ্গের রূঢ় আঘাত নেই। তারাকান্ত এণ্ট্রান্সে জলপানি পাননি, সরকারের তিন আইন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সোণার মেডেল পেতে দেয়নি। বিভূতি পেয়েছে। তাকে পেতেই হ'ত।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে বিভূতি চলে গেল কলকাতায়। যাওয়ার আগের দিন সে কেঁদে ফেললে।

—কাকামণি, তোমাকে ফেলে আমি কেমন করে থাকব?

তারাকান্ত জোর করে হাসলেন—আজীবন বুদ্ধিবাদী, বাস্তবপন্থী তারাকান্ত। সংসারের ক্ষেত্রে এরকম দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে নেই :

—Now, now, don't be carried by sentiment! পুরুষ মানুষকে বিদেশে যেতেই হয়। তা ছাড়া তুমি যাচ্ছ লেখাপড়া শিখতে, বীরের মতোই যে যেতে হবে তোমাকে।

বিভূতি তবু কাঁদতে লাগল।

সান্ত্বনা দিয়ে তারাকান্ত বললেন, ছি ছি বড় হয়েছ, এখন কি ছেলে-মানুষের মতো কাঁদতে হয়? আর কলকাতা তো ঘরের কাছে, এর পরে তোমাকে বিলেত পাঠাবো যে।

বিভূতি ভিজে চোখ দু'টোকে বড় বড় করে কাকমণির দিকে তাকালো।

—বিলেত?

—তা ছাড়া কি? ওয়ার্ডসোয়ার্থ, মেকলে, গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের দেশ না দেখলে কেউ কি বড় হতে পারে? যাদের ভেতর থেকে ড্রেক, নেলসন কিংবা কিচেনারের জন্ম হয়, সে জাতিটাকে না চিনলে কেউ কি সত্যিকারের মানুষ হয় কখনো?

বিভূতি তবু কিন্তু উৎসাহিত বোধ করলে না।

—তা হোক, আমি কিন্তু কিছুতেই একা একা বিলেত যেতে পারব না কাকামণি।

অসীম স্নেহে দৃষ্টি গভীর হয়ে এল তারাকান্তের।

—আচ্ছা তার তো দেরী আছে, পরে দেখা যাবে সে সব। এখন তো দিগ্বিজয়ীর মতো কলকাতা চলে যাও। আর মনে রেখো, শুধু মানুষ হলেই তোমার পরিচয় শেষ হবে না, you must be a superman!

বিভূতি অতি-মানব হয়েছে কি না সে কথা জানবার দরকার নেই তারাকান্তের। কিন্তু সে যে ভালোয় মন্দে মিশিয়ে ঠিক তাঁরই নির্দ্দিষ্ট বাঁধা ফরমলাতে গড়ে উঠেছে এইটাই আজকে সব চেয়ে বড় কথা। পাথর কুঁদে কুঁদে মূর্তি গড়া এতদিন সমাধা হয়েছে, পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় এতদিনে পড়েছে সমাপ্তির কালির আঁচড়।...

ঘট্ ঘট্ ঘটাং—

তারাকান্তের অন্যমনস্কতার ভেতর দিয়ে এর মধ্যেই কখন জেগে উঠেছে সমস্ত ষ্টেশনটা। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস আসবার প্রথম ঘণ্টাটা বাজল, আরো কয়েক মিনিট। একটা হিন্দুস্থানী ঝাড়ুদার কোন্ ফাঁকে এসে প্ল্যাটফর্মটা ঝাঁট দিতে সুরু করেছে, উদ্গত ধূলোর গন্ধে বনধুতরোর গন্ধটা চাপা পড়ে গেল।

—কৈলেস, ও কৈলেস?

সারা রাত গাড়ি হাঁকিয়ে এসে কৈলাস একপাশে বসে ঝিমুচ্ছিল। তারাকান্তের ডাকে সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

—আজ্ঞে, ডাকছেন কর্তা?

—আর ঘুমোসনি। স্টোভটা জ্বেলে ফেল এবেলাই, গাড়ী এসে গেল রে।

কৈলাস শশব্যস্তে চলে গেল জলখাবারের বন্দোবস্ত করতে।

সদ্য নিদ্রোত্থিত ষ্টেশন মাস্টার এতক্ষণে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন। বয়স অল্প, চুলের ছাঁট আর চশমার আধুনিক ফ্রেম তাঁর সৌখীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। বার তিনেক বড় বড় হাই তুলে তিনি গুনগুন করে সিনেমার একটা গান ধরলেন।

আলাপ করবার জন্যে এগিয়ে এলেন তারাকান্ত।

—ইয়ে শুনছেন!

সশ্রদ্ধ চোখে তারাকান্তের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ষ্টেশন মাস্টার,, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

—মানে, নর্থ বেঙ্গলের স্টপেজ আর টাইমিং-এর ভেতর কিছু বদলে যায়নি তো?

নিজস্ব প্রসঙ্গের সুযোগে ষ্টেশন মাস্টার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন: আজ্ঞে না, দু বছরের ভেতর এর আর কোনো অদল-বদল হয়নি। সেই ট্র্যাডিশন নিয়েই চলছে। আপনার দার্জিলিং মেল বলুন, আসাম মেল বলুন, এ লাইনের এটাই সেরা ট্রেণ কিনা।

আপ ষ্টেশনের ফোনটা ক্লিং ক্লিং শব্দে সাড়া দিয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার মাঝখানেই ষ্টেশন মাষ্টার থেমে গেলেন।

—ওই, ট্রেণ এল বুঝি। আসুন না, ভেতরে বসুন এসে—ষ্টেশন মাষ্টার দ্রুতপদে অফিসের ভেতর তিরোধান করলেন।

কিন্তু ভেতরে গিয়ে বসবার সময় নেই আর। তারাকান্ত শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ট্রেণ এসে পড়ল, মানে এসে পড়ল বিভূতি। চা-জলখাবারের বন্দোবস্ত সময় মতো করে না রাখলে ঢের দেরি হয়ে যাবে গোরুর গাড়িতে উঠতে। তা ছাড়া কৈলাস যা আনাড়ি—কতদূর কী ক'রে বসে আছে কে জানে।

সিগন্যালগুলো নেমে পড়লো। আর দেরী নেই গাড়ির। কৈলাস

যা হোক ক'রে জলখাবারটা নামিয়ে ফেলেছে শেষ পর্যন্ত, ট্রেণটা এসে গেলে চা ভিজিয়ে দিলেই হবে।

বিভূতি তা হলে সত্যিই আসছে। তারাকান্তের হাতে গড়া বিভূতি। সুচিন্তিত গল্পের সুসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। নিপুণ হাতে খোদাই করা নিখুঁত ভাস্কর্যের মূর্তি। বিভূতির ভেতর দিয়ে তারাকান্ত নিজেকেই নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছেন।

ট্রেণ এসে গেল। বাঁকের মুখে খানিকটা হাল্কা অস্পষ্ট ধোঁয়া—তারপরে দীর্ঘ সরীসৃপের মতো নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের যান্ত্রিক দেহটা। সরীসৃপ নয়—লোহার ঝড়। প্রচণ্ড গতিবেগে স্টেশনটাকে থর থর ক'রে কাঁপিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে ভিড়ল।

ইণ্টার ক্লাস থেকে নামল খদ্দর পরা বিভূতি। কতদিন—কতদিন পরে। উদ্বেলিত বুকে তারাকান্ত এগিয়ে গেলেন। নত হয়ে বিভূতি দু' হাতে তাঁর পায়ের ধুলা নিলে।

—তারপর, তারপর বেশ ভালো আছে তো শরীর?

—আছে কাকামণি। তুমি ভালো তো?...এই যে অজিত, প্রদ্যোৎ, এদিকে এসো।

আরো দুটি সুদর্শন ছেলে এগিয়ে এসে তারাকান্তকে প্রণাম করলে।

—বেশ, বেশ। প্রগাঢ় বিস্ময়ভরে তারাকান্ত বললেন, এরা বুঝি তোমার সঙ্গেই এলেন? তা এঁদের কথা আগে তো কিছু জানাওনি।

লজ্জিত হাসি ফুটে উঠল বিভূতির মুখে।

—এরা আমার বিশেষ বন্ধু, হিতৈষীও বটে। খেয়ালের ঝোঁকে হঠাৎ চলে এল, তাই আগে থেকে জানাতে পারিনি।

বন্ধু এবং হিতৈষী! শপাং করে যেন একটা চাবুকের আঘাত নিষ্ঠুরভাবে এসে পড়ল তারাকান্তের মুখের ওপর। এই শব্দ দুটো তাঁর

কাছে বিস্ময়করভাবে অপরিচিত। আজ বিভূতির বিশেষ বন্ধু এবং হিতৈষীর অভাব নেই, আজ বিলেত যাওয়ার পথে কাকামণিকে না হলেও হয়তো বিভূতির চলে!

অদ্ভুত একটা অকারণ বেদনায় তারাকান্তের সমস্ত বুকের ভেতরটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। মনে হল: কোথায় কী যেন একটা ভুল রয়ে গেছে। মূর্তি রচনা হয়তো সম্পূর্ণ হয়নি, হয়তো, হয়তো এখনও তারাকান্তের বাঁধা ফর্মুলার বাইরে কোথায় একটা স্বতন্ত্র সত্তা প্রচ্ছন্ন রয়েছে বিভূতির।

তারাকান্ত শুষ্ক স্বরে বললেন, তা বেশ বেশ। ভারী খুশি হয়েছি এঁদের দেখে।

কোথা থেকে স্টেশন মাষ্টার ছুটতে ছুটতে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—নমস্কার, নমস্কার বিভূতি বাবু! আপনি এখানে? আপনাদের মতো লোককে এসব জায়গায় দেখতে পাব এমন আশাই তো করি না।

বিভূতি স্মিত মুখে প্রতিনমস্কার ক'রে বললে, এখানেই তো আমার বাড়ি। আর ইনি আমার কাকা। কিন্তু আপনি আমাকে কী ক'রে চিনলেন?

—ইনিই আপনার কাকা? নমস্কার। বাঃ আপনাকে চিনব না, বলেন কি। বাঙলা দেশে এমন কে আছে যে শ্রেষ্ঠ আধুনিক সাহিত্যিক বিভূতি মৈত্রকে চেনে না? কলকাতায় আপনাকে কতবার দেখেছি— স্টেশন মাষ্টার অত্যন্ত আপ্যায়নের হাসি হাসলেন: আসুন, আজ আমার এখানে চা খেয়ে—

অত্যন্ত রূঢ়ভাবে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন তারাকান্ত! বললেন, সাহিত্যিক! তার মানে তুমি লিখছ নাকি আজকাল? কই, আমি তো কিছুই জানি না!

তারাকান্তের কণ্ঠস্বরে বিভূতি চমকে উঠল। বিস্মিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললে, লিখছি সামান্য সামান্য, কিন্তু সে তো তোমাকে জানাবার যোগ্য নয় বলেই জানাইনি কাকামণি!

বিভূতির শেষ কথাটা তারাকান্তের কাণে গেল না। মনে হল: স্বপ্ন হয়তো সার্থক হয়েছে, হয়তো তাঁর নিজের হাতে গড়া প্রতিকৃতির নৈপুণ্যে কারো এতটুকু সন্দেহ করবার কারণ নেই। কিন্তু সৃষ্টি কখন যে স্রষ্টাকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছে তারাকান্ত তা কি জানতেন? আজ তাঁর আর বিভূতির মাঝখানে সমস্ত পৃথিবী এসে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। তার ভেতর থেকে নিজের গড়া বিভূতিকে আর আলাদা ক'রে, একান্ত ক'রে খুঁজে পাবেন না তিনি। তাঁর রচনা তাঁকে ছাড়িয়ে এত দূরে চলে গেছে যে সেখানে তাঁর আর এতটুকুও দাবি নেই। তাঁর নিজস্ব পাণ্ডুলিপি আজ যে তাঁরই হাতের লেখাকে নিশ্চিহ্নভাবে মুছে দিয়ে ছাপার অক্ষরে সমস্ত পৃথিবীর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে মুক্ত হয়ে গেছে, এই কি তিনি চেয়েছিলেন?

ষ্টেশন মাষ্টার আবার বললেন, আসুন, আসুন, চা-টা না খাইয়ে কিছুতেই এ বেলা ছেড়ে দেব না আপনাদের।

নক্র-চরিত

দরজায় ঠক্ ঠক্ করে তিন চারটে টোকা পড়ল। খেরো-খাতায় কষ-কালির আঁচড় টানতে টানতে ভ্রূকুঞ্চিত করে মুখ তুলে তাকালো নিশিকান্ত কর্মকার। শব্দটার অর্থ সে বুঝতে পেরেছে।

বাইরে কালো রাত—তারস্বরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, আর ঘরে মিট মিট করে জ্বলছে কেরোসিনের আলো। বেশি তেল পুড়বার ভয়ে নিশি কখনো আলোটাকে বাড়াতে চায় না। আধা-অন্ধকারে কাজ করতে করতে শকুনের চাইতেও সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে তার চোখের দৃষ্টি। খেরো-খাতায় কষ-কালির লেখাগুলোকে সে পিঁপড়ের সারির মতো সাজিয়ে চলেছে—আজকের দিনের জমাখরচ।

ঠক্ ঠক্ ঠক্। শব্দটা চেনা, তবু—তবু কে জানে! নিশি কর্মকারের শকুনের মতো চোখ দুটোর ওপর সংশয়ের ছায়া এল ঘনিয়ে, কপালে দেখা দিলো এলোমেলো সরীসৃপ রেখা। বাতির অস্পষ্ট আলোয় ঘরের কোণে বিলিতী লোহার সিন্দুকটার হাতল আর ভারী হবসের তালা দুটো ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে। কাঁচা সোণায়, গয়নাতে, নোটে এবং নগদে প্রায় বিশ হাজার টাকা অলংকৃত করেছে ওই সিন্দুকটার জঠর।

কলম রেখে নিশি উঠে দাঁড়াল। লোকটা কুঁজো। বয়সের চাপে নয়, খাতা আর হাতুড়ির সংস্রবেই অকালে তার পিঠটা বেঁকে গিয়েছে ধনুকের মতো। অত্যন্ত সতর্ক হাতে দরজার ভারী খিলটা সরিয়ে দিলে সে।

ঘরে ঢুকল চারজন লোক—মুখ চেনা না থাকলে নিশি আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠত। তাদের কারো চেহারাই উজ্জ্বল দিবালোকে দেখবার বা দেখাবার মতো নয়। মালকোচা আঁটা, মুখের উপর চূণ আর ভুষা-কালির বর্ণ-বিন্যাস চালিয়ে বিকট চেহারাকে বিকটতর করে তুলেছে তারা। হাঁটু পর্যন্ত কাদা। হাতে তাদের তেল-পাকানো বাঁশের লাঠি, ক্ষুরের মতো ধারালো চকচকে দীর্ঘ হাসুয়া। একজনের মাথায় ভারী একটা টিনের ট্রাঙ্ক, আর একজনের হাতে একটা পুঁটলি, শাড়ি দিয়ে বাঁধা।

নিঃশব্দে পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

ট্রাঙ্ক আর পুঁটলি সামনে নামিয়ে তারা শ্রান্তভাবে বসে পড়ল। চার মাইল পথ ছুটে আসতে হয়েছে, ক্লান্তিতে ভারী ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে তাদের। আট দশটা হাটের গাড়ি তাদের পিছনে পিছনে আসছিল, একটু হলেই ধরা পড়ে যাওয়া আশ্চর্য ছিল না। যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে একজন পায়ের দিকে তাকালো। ইটের ঘা লেগে বেমালুম নখ উড়ে গেছে একটা। মাটি মেশানো কালো রক্ত সেখান থেকে টপ টপ করে ঝরে পড়ছিল।

নিশি কর্মকার জিজ্ঞাসু চোখে একবার ট্রাঙ্ক আর একবার পুঁটলির দিকে তাকালো।

—আজকের শিকার ?

হুঁ।

—সোণাদানা মিলেছে ?

—খুলে দেখ না। গয়না যা পাওয়া গেছে তা ওই পুঁটলিটাতেই।

আলোটা চড়িয়ে দিয়ে নিশি পুঁটলি খুলল। একরাশ সোণারূপোর গয়না চকিত আলোর স্পর্শে ভয়াতুর চোখের মতো উঠল ঝিলিক দিয়ে। রূপোর মল, চুড়ি, ভারী টোড়া এক ছড়া, সোণার দু'ছড়া হার, বালা,

আংটি একটা। পাথর বসান কাণের দুল এক জোড়া, সেটা স্পর্শ করেই নিশি চমকে হাত সরিয়ে নিলে। নরম একটা মাংসের টুক্‌রো এখনো লেগে রয়েছে তাতে, আর সেই সঙ্গে আঠার মতো রক্ত। সময় সংক্ষেপ করবার জন্য কাণশুদ্ধই দুল জোড়াকে ছিঁড়ে এনেছে ওরা।

—ইস্, খুন হয়েছে নাকি!

সব চাইতে যে মোটা আর জোয়ান সেই-ই জবাব দিলে। কেউ না বলে দিলেও বুঝতে পারা যায় স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম মতোই সে এদের দলপতি। মোঙ্গলসুলভ খর্ব নাকের নীচে বিড়ালের মতো অল্প কয়েকগাছা লালচে গোঁফ খাড়া হয়ে রয়েছে, চোখ দুটো এত ঘোলাটে আর নিষ্প্রভ যে হলুদ মাখানো বলে মনে হয়। সমস্ত শরীরটা তার গাঁটে গাঁটে পাকানো, যেন পেশী দিয়েই তৈরী সেটা। নাম তার মদন।

মদন তিনটে উঁচু উঁচু বেঢপ আর নোংরা দাঁত বের করে হাসল।

—না, খুন হয়নি। দিতে চায়নি, তাই কেড়ে আনতে হয়েছে।

দলের মধ্যে সব চাইতে ছোট যোগী চুপ করে বসে ছিল। রাহাজানির কাজে এই বছরই সে হাতে খড়ি দিয়েছে। অন্ধকার রাত্রিতে অসহায় পথিকের আর্তনাদ এখনো তার বুকের মধ্যে ঢেউ জাগিয়ে তোলে, হাসুয়ার কোপ যখন হিংস্র একটা হাসির মতো মাথার ওপর ঝকমক করে ওঠে, তখন মৃত্যু-ভীতের বিস্ফারিত দৃষ্টি সে সহ্য করতে পারে না। তার স্নায়ু এখনো এই নিশাচরের জীবনটাকে সহজভাবে আয়ত্ত করে নিতে পারেনি।

যোগী বললে, উঃ, কী রকম কাঁদছিল মেয়েটা। ওভাবে কেড়ে না নিলেই--

মদন হো হো করে হেসে উঠল।

—এসব তোর কাজ নয়। ভূঁইমালীর নাম ডুবিয়েছিস তুই। কাল

থেকে ঘরে চলে যা, ধামা-কুলো তৈরী কর্‌গে বরং। মেয়েমানুষের মন নিয়ে এসব জোয়ানের কাজ করা যায় না।

অপ্রতিভ যোগী নীরব হয়েই রইল। সে ভয় পায়নি, কিন্তু সংশয় দেখা দিয়েছে তার মনে। জোয়ানের কাজ! জোয়ানের কাজ কি এইরকম! কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রহীন রাত ঘুটঘুট করছে চারদিকে, ফাঁকা মাঠের এখানে ওখানে মিশকালো শ্যাওড়ার জঙ্গল—তার সর্বাঙ্গে অজস্র জোনাকি জ্বলছে ভূতের চোখের মতো। তারি মাঝখান দিয়ে গোরুর গাড়ির 'লিক', মাঝে মাঝে জল আর কাদা জমে রয়েছে তাতে। আর শ্যাওড়া গাছের ছায়ার নীচে নিজেদের প্রায় মিশিয়ে দিয়ে ওরা বসে আছে আকুল প্রতীক্ষায়, কখন একখানা সোয়ারী গাড়ি আসবে সেই পথ দিয়ে এগিয়ে। দূরে মাঠের মাঝখানে বড় একটা আলো দেখা দেয়, ওদের উদগ্র ধমনীতে নামে চঞ্চলতার জোয়ার। মদন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় —অন্ধকারের মধ্যেও যোগী দেখতে পায় তার চোখ দুটো বাঘের মতো পিঙ্গল লুব্ধ আলোয় ঝকে উঠেছে, আর হাতের মুঠোয় কাঁপছে হাসুয়ার ফলাটা। আলোটা আশাপ্রদভাবে দপ দপ করে খানিকটা এগিয়ে আসে, তারপরেই মরীচিকার বিভ্রম জাগিয়ে অন্ধকারের অথই সমুদ্রে তলিয়ে যায় কালো একটা বুদ্‌বুদের মতো। নাঃ, আলেয়া।

হতাশায় বেঢপ দাঁতগুলো দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে হিংস্রভাবে কামড়ে ধরে মদন। একটা অশ্রাব্য গালাগালি বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে।

—আজ রাত্তিরটাই বৃথা গেল, একশালা গাড়িরও কি আসতে নেইরে! ভগবানের একি অবিচার বল্‌ দেখি?

সত্যিই তো, ভগবানের এ কি অবিচার। যোগী বিস্মিত হয়ে ভাবে। আরো একটু বিবেচনা থাকা উচিত ছিল ভগবানের তরফ থেকে। এই যে সারাটা রাত তারা শিকারের সন্ধানে অতন্দ্র হয়ে বসে আছে, মাঠের

যত মশা সুযোগ পেয়ে চারপাশ থেকে প্রাণপ্রণে এসে ছেঁকে ধরেছে তাদের, এত কষ্ট আর পরিশ্রমের কোনো পুরস্কারই কি নেই? ভারী ভারী গয়না পরা তিন চারটে মেয়েমানুষ শুদ্ধ দু' একখানা গাড়ি এই রাত দেড়টার সময় তিনি তো ইচ্ছে করলেই পাঠিয়ে দিতে পারেন। জীব সৃষ্টি করেছেন অথচ তাদের আহার যোগাবার বেলায় এত কার্পণ্য কেন?

কিন্তু সাধনার সিদ্ধি আছেই। একখানা গাড়ি দেখা দেয় শেষ পর্যন্ত। ফস করে একটা মশাল জ্বালিয়ে নেয় মদন, তারপর বিকট একটা চীৎকার করে ওরা আটকে দাঁড়ায় পথ। মশালের লাল আলোয় গরুর বড় বড় চোখগুলো অদ্ভুত ভয়ার্ত মনে হয়। গাড়োয়ানটা লাফিয়ে পড়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে পালায়, যাত্রীদের অসহায় কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে দিগ্‌দিগন্ত।

জোয়ানের কাজ! কথাটা যোগী ঠিক বুঝতে পারে না।

তার চেতনাকে সজাগ করে দিয়ে নিশি কর্মকার কথা কয়ে উঠল।

—বারো ভরি রূপো।

—আর সোণা?—মদনের কণ্ঠস্বর উৎকণ্ঠিত শোনালো।

—সোণা? সোণা কোথায়? কুড়িয়ে বাড়িয়ে তিন ভরিও হবে না বোধ হয়।

—বল কি। মদন চমকে উঠল: এই হার, চুড়ি—

—সব গিল্টি।

—গিল্টি!—মদন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল নিশি কর্মকারের মুখের দিকে। সে মুখের একটি পেশীও কাঁপছে না, কেবল কপালের রেখাগুলো সরীসৃপের মতো সর্পিল হয়ে উঠেছে মাত্র। তার মুখ থেকে একটি কথারও পাঠোদ্ধার করা যাবে না, আবিষ্কার করা যাবে না তার মনোজগতের এতটুকুও সংবাদ। অরণ্যের মতোই তার মন দুর্গম আর

রহস্যময়—শুধু নিকেল ফ্রেম দেওয়া পুরু কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে তার দৃষ্টি অসম্ভব রকম লোভাতুর হয়ে উঠেছে।

নিশি কর্মকার ভ্রূকুঞ্চিত করলে।

—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তা হলে তোমাদের মাল তোমরাই নিয়ে যাও, বদনামের মধ্যে আমি নেই।

মুহূর্তে মুষড়ে গেল মদন। নিশি কর্মকার রাগ করলে উপায়ান্তর নেই তাদের। এ সব কাজে এমন বিশ্বাসযোগ্য হুঁসিয়ার লোক আর পাওয়া যাবে না। গোলাপাড়া হাটের সে জাঁদরেল মহাজন; শুধু সোণা-দানা নয়, ধান চালের আড়ৎ, কাটা কাপড়ের ব্যবসা। গোলাপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সে প্রেসিডেণ্ট, সদর থেকে ছাপানো সব সরকারী খাম আসে তার নামে। তা ছাড়া হবিবগঞ্জ থানার দারোগা ইব্রাহিম মিঞাকে সে যে কী মন্ত্রে বশ করেছে কে জানে, পুলিশের হাঙ্গামা থেকে অন্তত নিশ্চিন্ত।

—না, না, তা বলিনি। তবে—

—এর মধ্যে তবে নেই আর—চশমাটা খুলে নিশি একটা টিনের খাপে পুরল: অধর্ম আমি কখনো করিনে, পরকাল বলে একটা জিনিষ আছে তো! পৌনে দুশোর বেশী কিছুতেই হয় না, তা আমি পুরোপুরি দুশো টাকাই ধরে দিচ্ছি, নিয়ে যাও।

—দু—শো! চারজনের স্বরেই নৈরাশ্য ফুটে বেরোল। কলাইগঞ্জের সাহাদের গাড়ি ধরেছিল তারা। ঐশ্বর্যের দিক থেকে সাহারা বিখ্যাত ব্যক্তি, তাদের বাড়ির মেয়েদের গা থেকে মাত্র দুশো টাকার গয়না বেরোল! ব্যাপারটা বিশ্বাস করা কঠিন।

মদন একবার শেষ চেষ্টা করলে, অন্তত আড়াইশো—

—আর এক পয়সাও পারব না। ইচ্ছে না হয় ঘুরিয়ে নিয়ে

যাও, দেড়শোর বেশী যদি কেউ দিতে রাজী হয়তো আমার কাণ মলে দিও।

—তা কি হয়। অসহায় স্বরে মদন বললে, দাও, দুশোই দাও তবে।

এতক্ষণে নিশি কর্মকার হাসল। তার হাসিটা সস্নেহ এবং স্বর্গীয়।

—কেন এত অবিশ্বাস বলো তো। তোমাদের এত কষ্টের রোজগার, মিথ্যে প্রবঞ্চনা যদি করি তা হলে তা কি ধর্মে সইবে কখনো। তা ছাড়া পরোলোকে জবাবদিহিও তো করতে হবে। যথা ধর্ম তথা জয়—অধমের রোজগার গোমাংস আর গোরক্ত।

বিরস মুখে টাকাগুলো নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। অন্ধকারে মদনের কালি মাখা ভূতুড়ে মুখটা আরো কালো আর ভয়ানক হয়ে উঠেছে। চাপা দাঁতগুলো একবার সশব্দে কড়মড় করে উঠল তার। নিশি কর্মকারের রুদ্ধ দরজার দিকে সে একবার অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো।

—বলে অধর্মর টাকা গোমাংস আর গোরক্ত! শালা বুড়ো শকুন কোথাকার! গিণ্টি আর আসল সোণা আমরা চিনতে পারি না! ইচ্ছে করছে লোহার বড় হাতুড়িটা তুলে মাথাটা ফাটিয়ে চৌচির করে দিই ওর। কিন্তু কী করব, ব্যাটা সরকারের পেয়ারের লোক, নইলে অ্যাদ্দিন—

মদনের কথার ভঙ্গিতে যোগীর হাসি এল। মদন বুনো ওল, কিন্তু নিশি বাঘা তেঁতুল।…

আর, ওরা বেরিয়ে গেলে আর একবার লণ্ঠনের আলোটা চড়িয়ে দিয়ে নিশি কর্মকার গয়নাগুলোকে পরীক্ষা করলে। এখনো যেন নারীদেহের উত্তাপ আর স্বেদের গন্ধ সেগুলোতে জড়িয়ে রয়েছে। কম করেও হাজার টাকার জিনিস, সাহাদের নজরটা যে উচুঁ আছে সে কথা মানতেই হবে।

কিন্তু অধর্মের টাকা গোমাংস আর গোরক্ত ! নিজের কথাটা মনে পড়তেই রেখাজটিল মুখে খানিকটা হাসি প্রকট হয়ে উঠল : অধর্মের সংজ্ঞা আলাদা বই কি। চোরের উপর বাটপাড়িকে কোনো আহাম্মুখই অধর্ম বলবে না।

রাত্রে নিশির ভালো ঘুম হয় না। এই বহু বাঞ্ছিত অনিদ্রাটা অনেক আয়াস স্বীকার করে তবে আয়ত্ত করতে হয়েছে তাকে। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গাছের পাতা খস্ খস্ করে নড়ে। আর বিছানার মধ্যে নিদ্রাহীন চোখ সজাগ হয়ে থাকে সন্দেহের প্রখরতায়। ঘাসবনের ভেতর দিয়ে সাপ চলে যায়, কাণ খাড়া করে সে অনুধাবন করে তার চলার ক্রমবিলীন শব্দটাকে। ঘরের মধ্যে তরল অন্ধকার, তবু তার ভেতর সে স্পষ্ট দেখতে পায় বড় লোহার সিন্দুকটার ঝক্‌ঝকে হাতল আর ভারী হব্‌সের তালা দুটো সতর্ক প্রহরীর মতো জেগে রয়েছে। বুভুক্ষু ইঁদুরগুলো মখমলের মতো ছোট ছোট পা ফেলে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু নিশি কর্মকারের ঘরে কুড়িয়ে খাওয়ার মতো এতটুকু উদ্বৃত্ত অপচয় খুঁজে পায় না তারা।

প্রহরে প্রহরে শিয়ালের জয়ধ্বনি চিহ্নিত করে রাত্রিকে। তারপর বাইরের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসবার আগেই উঠে বসে নিশি কর্মকার। বৈষ্ণব মানুষ। মালা জপ শেষ করে জুড়ে দেয় বেসুরো গলায় কীর্তন। সমস্তটা দিন নানা বিষয়-কর্মে সংসারের আবিলতার মধ্যে কাটাতে হয়, তাই ব্রাহ্মমুহূর্তে যতটুকু পারে পুণ্য অর্জন করে নেয় সে।

সকাল বেলা এক ধামা খই আর এক থাবা আখের গুড় নিয়ে এসে দেখা দেয় বিশাখা। নিশির সেবাদাসী।

বিশাখা নামটা তারই দেওয়া। ভেক নেবার আগে বিশাখা ছিল হাড়ির মেয়ে, নাম ছিল কষ্টবালা। কিন্তু গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে তার

সমস্ত কষ্ট দূর করে দিয়েছে বৈষ্ণব-তিলক নিশি কর্মকার। আপাতত সে শ্রীরাধার অনুচারিণী এবং নিশির বৃন্দাবন লীলার লীলাসঙ্গিনী।

আজো সকালে নিয়মমতো খইয়ের ধামা হাতে বিশাখার আবির্ভাব হল।

বহুদিন পরে নিশি একবার চোখ তুলে তাকালো বিশাখার দিকে। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর ধরে সে এমন করে ওর মুখের দিকে তাকাতে ভুলে গিয়েছে। বার্ধক্য এসে ওকে সরিয়ে নিয়েছে তার জীবন থেকে; কিন্তু এই সকালে বিশাখা সদ্য স্নানের পর চন্দন সেবা করে এসেছে, তেল আর চন্দনের চমৎকার সুগন্ধের সঙ্গে খানিকটা প্রথম সূর্যের আলো ওর মুখের ওপর পড়ে ঝলমল করে উঠল। তড়িৎচমকের মতো নিশির মনে হল ঃ তারই বয়স বেড়েছে শুধু, তারই জীবনগ্রন্থির সমস্ত রস গেছে শুকিয়ে; কিন্তু যৌবনের ভরা লাবণ্যে বিশাখা এখনো টলমল করছে শতদল পদ্মের মতো। এত মধু—এত প্রচুর মাধুরী, আজ তার এ আস্বাদন করবার অধিকার নেই, সামর্থ্যও নেই। সিন্দুকের জমানো সোনার তালগুলোর মতো রূপের এই প্রতিমাকে সে পাহারাই দিয়ে চলেছে, রাজভাণ্ডারে সে প্রহরী মাত্র। হাত বাড়িয়ে খইয়ের ধামাটা নেবার কথা তার মনেই রইল না।

—আজ তোকে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে সখী।

সখী মুখ ঘুরিয়ে নিলে। নিশির স্তুতি বাক্যে তার দেহে মনে আর আলোড়ন জাগে না আজকাল। বললে, বুড়ো বয়সে রস তো খুব উথ্‌লে উঠছে দেখছি!

—বুড়ো!—তা বটে। সমস্ত শরীর দিয়ে সে আজ অনুভব করে তার শিরাস্নায়ুগুলোর নিরুপায় পঙ্গুতা। অথচ এককালে গ্রামের কোন্ সুন্দরী মেয়েটাকে অন্তত সে দু'দিনের জন্যে আয়ত্ত করেনি? আর

এই মুহূর্তে তার নিজের বিশাখাই তার ক্ষমতার বাইরে! অথচ এখন কি অপূর্বই না দেখাচ্ছে বিশাখাকে! হাড়ির মেয়ে হলেও রংটা তার ফর্সা, প্রৌঢ়-যৌবনে মুখখানা আজকাল দিব্যি ভারী আর গোল গাল হয়ে উঠেছে; পাকা সিঁদুরে-আমের মতো তার গালের রঙ, পানের রসে পাতলা ঠোঁট দু'টি টুক্ টুক্ করছে। কপালে ছোট একটা উল্‌কির দাগ, সমস্ত মুখখানার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যেন। অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় নিশির বুকের ঠাণ্ডা রক্ত যেন হঠাৎ শিউরে উঠল শির শির করে।

—একবারটি কাছে আসবি বিশাখা?

বিশাখার চোখে সন্দেহের ছায়া পড়ল।

—ব্যাপার কী, নেশাটেশা ধরেছ নাকি?

—নেশা ধরিনি, নেশা লাগছে।—নিশি বিগত যৌবনের মতো প্রগল্‌ভ হবার চেষ্টা করছে: কাল রাতে দু'ছড়া হার বাগিয়েছি, নিবি তার একগাছা?

বিশাখার চোখে সন্দেহ ঘনীভূত হল: ওরে বাপ্‌রে, এত কপাল! আমি বাঁচব তো?

—কেন, কোনদিন কিছু তোকে দিইনি বুঝি?

ক্রিং ক্রিং করে বাইরে সাইকেলের ঘণ্টা শোনা গেল, তারপরেই জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ করতে করতে কে উঠে এল দাওয়ায়। ডাক শোনা গেল: কর্মকার বাড়ি আছ হে?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো নিশি চম্‌কে উঠল: ইব্রাহিম দারোগা এসেছে:

বিশাখার গৌর মুখে রঙীন আভা দেখা দিয়েছে। আচম্‌কা হাওয়া-লাগা দীঘির জলের মতো একটা চকিত-চাঞ্চল্য তার সর্বাঙ্গে লাবণ্যের ঢেউ খেলিয়ে গেল। ব্যাপারটা নতুন করে বোঝবার কিছু নেই, তবু

একটা তীব্র ঈর্ষ্যা এসে ক্ষণিকের জন্যে নিশিকে আচ্ছন্ন করে দিলে।

—ওঃ, তাই আমি বুড়ো হয়ে গেছি! এই জন্যই আমাকে মনে ধরে না আর।

নিশির মনের কথা বিশাখা বুঝতে পেরেছে। দরিদ্রের ব্যর্থ লোভ দেখে তার সহানুভূতি হয়। কিন্তু সহানুভূতি ছাড়া আর কী সম্ভব।

—এত হিংসে কেন? এ নইলে অনেক আগেই যে হাতে দড়ি পড়ে যেত, সেটা খেয়াল নেই বুঝি।

সত্যি, খুব সত্যি কথা। ইব্রাহিম দারোগার মত মদহস্তী এই বাঁধনেই তো এমনভাবে বাঁধা পড়েছে! হিংসা করে কোনো লাভ নেই, শুধু বুকের ভেতর থেকে ঠেলে মস্ত বড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস এল বেরিয়ে।

ততক্ষণ ঘর থেকে দ্রুত-চরণে অদৃশ্য হয়ে গেছে বিশাখা। মহামান্য অতিথি এবং মূল্যবান প্রেমিক। বাইরে তাকে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখা চলে না। খানিকটা মিষ্টি হাসি উপহার দিতে হবে তাকে। এক কাপ চা, এক খিলি পান। মাঝে মাঝে দারোগা রাতটাও কাটিয়ে যায় নিশির বাড়িতেই। গ্রামের সবাই ব্যাপারটা জানে, কিন্তু একটি কথা বলবারও সাহস নেই তাদের। জলে বসতি করে কুমীরের সঙ্গে বিরোধ না করার প্রাজ্ঞতাটুকু অন্তত আশা করা যায় তাদের কাছ থেকে। গোলাপাড়া হাটের সবচেয়ে বড় মহাজন নিশি কর্মকার; আর দারোগার প্রতাপ সম্বন্ধে কিছু না ভাবাই ভালো—যুদ্ধ বাধবার পর থেকে ভারতরক্ষা আইনের অস্ত্রে শস্ত্রে সে আপাদ-মস্তক মণ্ডিত হয়ে আছে।

ইব্রাহিম দারোগাকে কিছুটা অপ্রসন্ন মনে হল আজকে। তিনচারটে ডাকাতি হয়েছে তার এলাকায়, অথচ কোনটারই কোনো কিনারা হয়নি। ওপর থেকে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কড়া অর্ডার এসেছে, এভাবে চললে ট্রান্সফার করে দেওয়া আশ্চর্য নয়।

হাতের বেতটাকে জুতোর ওপর ঠুক্ ঠুক্ করে ঠুকতে লাগল ইব্রাহিম দারোগা।

—একটু সামলে চালাও কর্মকার। তোমার জন্যে কি আমার চাকরীটা যাবে?

নিশির শকুনের মতো চোখ দুটো বিনয়ে কাতলা মাছের মতো নির্বোধ হয়ে এল: হুজুরের যেমন কথা।

—না, না সত্যি। ওপর থেকে বড্ড তাগিদ দিচ্ছে। ফস করে তোমার নামটা বেরিয়ে পড়লে আর আটকাতে পারব না। ইন্‌সপেক্টার ব্যাটাকে তো জানো? শালা স্রেফ রাঘববোয়াল। ওর মুখটা বন্ধ না করলে আর—

নিশির মুখে হাসি দেখা দিল। কথাটার অর্থ সে বোঝে। সিন্দুকটা খুলে ছোট একটা নোটের তাড়া সে দারোগার দিকে এগিয়ে দিলে। আর প্রাপ্তি মাত্রেই দারোগা অত্যন্ত সহজভাবেই নোটগুলো নিয়ে পুরল পকেটে, কালো চাপদাড়ি মণ্ডিত মুখখানা খুসিতে ভরে উঠেছে তার। লোকটার শরীরে বোধ হয় কিছুটা পাঠানের রক্ত আছে, সবটা মিলিয়ে একটা অমার্জিত আদিমতার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্ পাষণ্ড বলে যে, আজকাল রাজভক্তি লোপ পেয়ে গেছে বঙ্গদেশ থেকে? স্বদেশীওলারা যত লম্ফ-ঝম্পই করুক না কেন, ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে নিশি কর্মকারের মতো বিবেচক আর বুদ্ধিমান লোক পাওয়া যাবে। এ নইলে আর পুলিশে চাকরী করে সুখ ছিল কী!

একখানা রূপোর ডিশে পান আর জরদা নিয়ে ঘরে ঢুকল বিশাখা। আড়চোখে তার দিকে একবার তাকিয়ে এক মুঠি পান আর ছটাকখানিক জরদা হাঙ্গরের মতো প্রকাণ্ড হাঁয়ের মধ্যে চালিয়ে দিলে দারোগা। পান

খেয়ে খেয়ে দারোগার মুখটা কী অস্বাভাবিক লাল! হঠাৎ দেখলে মনে হয় লোকটা রক্ত খায় বুঝি।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা। চাল তো পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। তোমার আড়তে কিছু আছে নাকি? ওপরে একটা রিপোর্ট দিতে হবে।

—চাল? আমার আড়তে?—নিশি বিস্ময়ে হতবাক: কোথায় চাল! জৈষ্টি মাসেই সব সাবাড় করে দিয়েছি। নিজের জন্যে সামান্য যা আছে তাতেই তো নতুন ধান ওঠা পর্যন্ত চলবে না—টান পড়ে যাবে।

কালো চাপ দাড়ির ফাঁকে দারোগার জন্তুর মতো মুখে দন্তুর হাসি দেখা দিলে: তুমি বাবা একটি সাক্ষাৎ ঘোড়েল—ভুঁড়ো কুমীর। তোমার আড়ত সার্চ করলে যে এখুনি পাঁচশো মণ চাল সীজ করা যায়, সে খবর আমি পাইনি ভাবছ?

নিশি প্রায় আর্তনাদ করে উঠল: হরে কৃষ্ণ! আমার আড়ত! এমন শত্রুতা আমার সঙ্গে কে করলে! আমার কি ধর্মভয় নেই একটা! পরলোকে জবাবদিহি তো করতে হবে।

ইব্রাহিম দারোগা সবিদ্রূপে বললে, থাক থাক। এই সক্কাল বেলা একরাশ মিথ্যের সংগে ধর্ম বেচারাকে আর জড়াচ্ছ কেন? বিস্‌মিল্লা বলে আমার দরগাতেই মুরগী জবাই করে দিয়ো, আমি বহাল তবিয়তে থাকলে তোমাকে ছোঁয় কে!

—সেই ভরসাতেই তো আছি হুজুর।

—চলি তা হলে—দারোগা উঠে দাঁড়াল। তারপর বিশাখার মুখের ওপর দৃষ্টিভোজনের মতো দুটো ক্ষুধার্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, আজ বড্ড ব্যস্ত, কাল আসব।

ঝরঝরে একটা হার্কিউলিস্ সাইকেলের আওয়াজ জেলা-বোর্ডের বন্ধুর পথ বেয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

দারোগা চলে গেলে নিশিকান্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। চাল,—তা চাল তার কিছু আছে বইকি। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে কোনো ব্যাটাই ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হতে পারে না। তুমি যদি পরকে না ঠকাও, তা হলে পরে তোমার মাথায় আছড়ে কাঁঠাল ভাঙবে এই হচ্ছে ছুনিয়ার নিয়ম। তবে দারোগা খাঁটি খবরটা পায়নি—পাঁচশো নয়, আটশো মণ। বারো টাকা দরে কেনা, বর্ষার বাজারে অন্তত চল্লিশে ছাড়া চলবেই। ছু' চারজন লোক তো এর মধ্যেই আনাগোনা শুরু করেছে, মিলিটারীর কণ্ট্রাক্ট নাকি পেয়েছে তারা; টাকার জন্যে আটকাবে না, একরাশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে নতুন নোট দিয়ে যে কোন দরেই কিনে নিতে রাজী হয়েছে। তবু বাজারের হালচাল আরো একটু দেখে-শুনে নেওয়াটাই ভালো।

—আপনার কাছেই যে এলাম কর্মকার মশাই।

গোলাপাড়া হাটের তিনজন মহামান্য মহাজন এসে দর্শন দিয়েছে। মধুসূদন কুণ্ডু, নিত্যানন্দ পোদ্দার আর জগন্নাথ চক্রবর্তী।

—এসো, এসো, তামাক খাও ভায়ারা। তারপর সবাই মিলে! ব্যাপারটা কি?

—ব্যাপার আর কিছু নয় দাদা, হরিসভায় একটা অষ্টপ্রহরের বন্দোবস্ত করছি। শুনছি সত্যযুগ আসছে, কল্কি অবতার নামবেন মর্ত্যে মহাপাপীদের বিনাশ করতে। দেশের যা অবস্থা হচ্ছে, তাতে নাম-কেত্তনটা—

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! কলির কলুষ দূর করতে ওর মতো জিনিষ কি আর কিছু আছে! কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব—

—কাল সন্ধ্যেয় তা হলে যেয়ো দাদা। কিছু চাঁদাও দিতে হবে।

হরিসভায় অষ্টপ্রহর কীর্তনের বিপুল আয়োজন। আট-দশটা কাটা

কলাগাছের ওপর মোমবাতি বসিয়ে আর লণ্ঠন ঝুলিয়ে তৈরী করা হয়েছে আসর। তলায় ছেঁড়া মাহুর পাতা, তার ওপর গাঁজার কল্‌কি সাজিয়ে নিয়ে গোলাপাড়া হাটের মহাজনেরা জমিয়ে বসেছে। গাঁজার কল্‌কির একটা অসামান্য মহিমা আছে—নেশাটা কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হলে যুগপাবন কল্কি প্রভুর অবতরণটা মনশ্চক্ষেই দেখা যায়। পাপীতাপীর এবার পরিত্রাণ নেই বটে, কিন্তু নাম এবং নেশার গুণে গোলাপাড়া হাটের মহাজনেরা যে সত্যযুগ অলংকৃত করতে চলেছে, কোনো পাষণ্ডই এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করতে পারে না।

আশপাশ থেকে একদল বোষ্টম-বোষ্টমী জড়ো হয়েছে—অষ্টপ্রহরের পরে বৈষ্ণব-ভোজনের ব্যবস্থা আছে। নেশায় রক্তাক্ত তাদের চোখ, আর ব্যাভিচারে ম্লান পাণ্ডুর মুখ। যে আলোচনা তাদের মধ্যে চলছে, তা আর যাই হোক আধিভৌতিক বা আধ্যাত্মিক কিছু নয়। ওদিকে একপাশে তিনটে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি আগুনে রক্তাভ হয়ে জ্বলছে,—থেকে থেকে একজন ধূপ ছড়াচ্ছে তাতে, অষ্টপ্রহরের ধুনী। একটু দূরেই বড় একটা হাঁড়িতে খিচুড়ি চাপানো হয়েছে—বৈষ্ণবদের চোখ থেকে থেকে সেদিক থেকে ঘুরে আসছিল।

—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—আসরের চারদিকে ঘিরে ঘিরে চলেছে অসংলগ্ন কীর্তন। অল্পবিস্তর পা টলছে দু একজনের, শুধু গাঁজা নয়, ভাবের সাগরে নিঃশেষে তলিয়ে যাওয়ার জন্যে কেউ কেউ তাড়িও টেনে এসেছে। একজন এমনভাবে খোলের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে যে, দেখে মনে হয় ওটা সে যেমন করে হোক ভাঙবেই—এই তার স্থির-সংকল্প। আর একজন ঊর্ধবাহু হয়ে তাণ্ডবতালে আকাশের দিকে লম্ফপ্রদান করছে, যেন ওপর থেকে কী একটা পেড়ে নামাবে; বোধ হয় ভক্তিবৃক্ষের মুক্তিফল।

নিশি কর্মকারের চোখ নিদ্রিত। সমস্ত দেহ তার কদম্ব কেশরের মতো রোমাঞ্চ—অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব একে একে প্রকট হয়ে উঠবে বুঝি। গোটা সভার উপর দিয়েই যেন ভাবের ঘোর লেগেছে। পোড়া মোমবাতি, গাঁজা, ধুনো, পোড়া কাঠ আর অর্ধসিদ্ধ খিচুড়ির একটা মিশ্রিত গন্ধে যেন নিশ্বাস আটকে আসে। মোমবাতির আলোগুলো দু' একটা করে নিবতে নিবতে ক্রমশ ম্লানতর হয়ে আসছে; ধূনীর আগুনের লাল আভা বোষ্টম-বোষ্টমীদের ব্যাভিচার-চিহ্নিত অপরিচ্ছন্ন মুখগুলোকে অদ্ভুতভাবে একাকার করে দিয়েছে। পেটভরে যারা তাড়ি টেনে এসেছিল, তাদেরি একজন নাচতে নাচতে ধড়াস করে আছড়ে পড়ল—দশা লেগেছে নিশ্চয়। ঊর্ধ্ববাহু লোকটির লম্ফপ্রদান আরো উদ্দাম হয়ে উঠেছে, একটুর জন্যে ফসকে যাচ্ছে ফলটা।

—বাবু, বাবু, প্রিসিডেণ্ট বাবু?

সুর কেটে গেল। সাক্ষাৎ ভগ্নদূতের মতো ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকীদার এসে দেখা দিয়েছে, নিশ্চয় জরুরি ব্যাপার আছে কিছু। নাঃ, প্রেসিডেণ্ট-গিরি করা আর পোষাল না। নির্বিঘ্নে একটু ধর্মকর্ম করবারও যদি জো থাকে।

—কি রে, কী খবর?

—উঠে আসতে হবে বাবু। সরকারী কাজ।

সরকারী কাজ। নিশি একবার ক্ষুব্ধ দৃষ্টিটা আসরের ওপর বুলিয়ে নিলে।

—কীর্তন চলতে থাকুক আপনাদের। আমি ঘুরে আসছি একটু।

বাইরে এসে নিশি ভ্রূকুটি করলে: কি রে, তোদের আর সময় অসময় নেই নাকি। এই রাত ব্যারোটায় এত তাগিদ কিসের?

চৌকীদারের কণ্ঠে উত্তেজনা: মতি পালের বৌ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে বাবু। একবার যেতে হবে।

—আর মতি পাল ?

—সেটাও মরেছে।

—আপদ গেছে।—বিরক্তিতে নিশির মুখ কালো হয়ে উঠল। কিছু প্রাপ্তি যোগ আছে বটে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্যিই ঝক্‌মারী। গ্রামে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কিম্বা কেউ অপঘাতে মরলে ছুটতে হবে সেই মড়া দেখবার জন্যে, থানায় রিপোর্ট করতে হবে। এই রাত বারোটার সময় যখন কীর্তনের আসরে ভাবের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে এসে ভর করেছেন ভক্তের ওপর, আর নাম গানে কলির কলুষ ধুয়ে মুছে নির্মল হয়ে যাচ্ছে, তখন কোথায় কে মতি পালের বৌ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে তাই দেখবার জন্যে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হতে হবে ! হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ।

বিরস মুখে নিশি বললে, চল্ তা হলে। কিন্তু বৌটা না হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, মতি পাল মরল কী করে ?

—বাঁচবে কী করে বাবু ?—সমবেদনা এবং ক্ষোভে চৌকীদারের স্বর রুদ্ধ হয়ে এল : না খেয়ে মরেছে। আগে ভিক্ষে করত, তিরিশ টাকা চালের বাজারে কে ভিক্ষে দেবে এখন ? বৌটাও আর পেটের জ্বালা সইতে পারেনি, তাই গলায় দড়ি দিয়েই ঝামেলা মিটিয়েছে।

—হুঁ।

চৌকীদার উৎসাহিত হয়ে উঠল : শুধু এই একটা বাড়িই নয় বাবু। এরকম চললে দু'মাসে দেশ উজাড় হয়ে যাবে। যে আগুন চারদিকে জ্বলছে, কারো রেহাই পাবার জো আছে ! দেখুন না, দু' তিন দিনের মধ্যে আরো পাঁচ সাতটা মরার খবর—

—হয়েছে, থাম্ থাম্।—নিশি ধমকে থামিয়ে দিলে তাকে। এসব কথা ভালো লাগে না শুনতে। যারা মরছে, মরুক তারা। কাল পূর্ণ

হলে মানুষকে মরতেই হবে, কেউ তো আর লোহা দিয়ে মাথা বাঁধিয়ে আসে না। না খেয়ে মরেছে, সে তো কৃত কর্ম্মের ফল। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির দেনা এ জন্মে শোধ করতেই হবে—হুঁ হুঁ বিধাতার রাজ্যে অবিচার হওয়ার জো নেই।

কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন পথ। দুধারে বাঁশের ঝাড় বাতাসে শব্দ করছে। সেই শব্দে নিশি চমকে গেল। মনে হল: সেই বাঁশ ঝাড়ের ভেতর থেকে এখুনি বেরিয়ে আসবে মাংসচর্মহীন অস্থিময় কতগুলো ছায়ামূর্তি—তিলে তিলে যারা না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে তাদের প্রেতদেহ। আচম্‌কা একটা ভয়ে নিশ্বাস আটকে এল তার। মনে হল: সেই মূর্তিগুলো আর্তনাদ করে উঠবে—আমাদের খাদ্য, আমাদের জীবন নিয়ে লোভের ভাণ্ডারে জমা করেছ তুমি। তোমার ক্ষমতা, তোমার খত, তোমার আইন আমাদের প্রতিহিংসার হাত থেকে বাঁচিয়েছে তোমাকে। কিন্তু—এখন? এখন? এখন?

নিশি প্রাণপণে জপ করতে লাগল: হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব—

মতি পালের বাড়ী। চারিদিকে নানা জাতের আবর্জনা—বৃষ্টির এক পসলা জল পড়ে সে আবর্জনাগুলো আরো কদর্য হয়ে উঠেছে। ভাঙা চাল, বাঁশ, খুঁটি, খসে পড়া দাওয়া। সারা বাড়ী ভরে একটা গুমোট ভাপ্‌সা আবহাওয়া—তার মাঝখানে যেন ঘন হয়ে রয়েছে বাসি মড়ার গন্ধ। নাকে কাপড় চেপে ধরে নিশি সন্তর্পণে এগোতে লাগল। কোথায় অষ্টপ্রহরের আসর, আর কোথায়—

মতি পাল বারান্দায়ই পড়ে আছে। পেটের জ্বালায় দাওয়া থেকে বুঝি খানিকটা মাটি কামড়ে খেয়েছিল, একরাশ কর্দমাক্ত বমি গালের দুপাশে জমে রয়েছে। পুরো বত্রিশটা দাঁতই তার বেরিয়ে আছে, মরবার

আগে কী একটা অসীম কৌতুকে খানিকটা পৈশাচিক হাসি হেসেছিল বলে মনে হতে পারে। পেটটা লেপ্‌টে রয়েছে পিঠের সঙ্গে, কালো কালো নগ্ন পা দুটোকে দেখাচ্ছে অস্বাভাবিক দীর্ঘ—যেন ভূতের পা। আর সব চাইতে অমানুষিক তার চোখ—যেন ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড ঠেলা লেগে বাইরে বেরিয়ে এসেছে তারা। একটা চোখের অর্ধেকটা খাওয়া, নিশ্চয়ই ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে!

সামনেই ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। আর তার মধ্যে—

চৌকীদারের লণ্ঠনের আলোটা সেখানে পড়বার অপেক্ষামাত্র। অবর্ণনীয় একটা আতংকে দাওয়া থেকে সোজা লাফ দিয়ে নিশি একেবারে হুড়মুড় করে চৌকীদারের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। মতি পালের বৌ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। শেষ সম্বল ছিন্ন লজ্জাবাস দিয়েই গলায় ফাঁস পরিয়েছে—লণ্ঠনের আলোয় সেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অস্বাভাবিক নারী-দেহটা একটা দানবীয় বিভীষিকা যেন!

কম্পিত গলায় নিশি বললে, হয়েছে, চল চল।

চৌকীদার বললে, লাস দুটো কী হবে বাবু।

—থানায় খবর দে, ওরা যা খুসি করুক। যত সব কর্মভোগ—হরে কৃষ্ণ!

আবার অন্ধকার বাঁশঝাড়ের পথ। হাওয়ায় বাঁশবনের একটানা শব্দ—ঘুণে খাওয়া ছিদ্রপথে যেন পেত্নীর কান্না বাজছে। ভয়ে নিশি কর্মকারের কোনো দিকে চোখ তুলে চাইতে সাহস হ'ল না। অসীম আতংকে কেবলি মনে হতে লাগল—সমস্ত বাঁশবনের পথ জুড়ে অসংখ্য মড়া ছড়িয়ে রয়েছে—তাদের কালো কালো শুকনো পাগুলো যেন ভূতের পা। আর বাঁশের আগায় আগায় গলায় কাপড়ের ফাঁস পরিয়ে ঝুলে রয়েছে অগণ্য নারীদেহ—তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ

দেহগুলো একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন। চারদিকে কি আজ মৃত্যুর সভা বসেছে!

উত্তপ্ত কপাল বেয়ে টপ্ টপ্ করে ঘাম পড়তে লাগল নিশির। এই মৃত্যু—এই অপঘাত, এদের জন্য দায়ী কে? দৈব?

—হরিসভা পর্যন্ত এগিয়ে দেব বাবু?

চৌকীদারের প্রশ্নে একটা আকস্মিক প্রচণ্ড কম্পন নিশির পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। তারপর সামলে নিয়ে শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করে সে বললে, না চল্, বাড়ীতেই পৌঁছে দিবি আমাকে। কাজ আছে।

হাটখোলা পেরিয়ে নিশি কর্মকারের বাড়ী। সামনে ছোট একটা আমের বাগান, ভালো ভালো ফজলী আর ল্যাংড়াই আমের কলম লাগিয়েছে সে। নিজের বাড়ী—চেনা পথ—তবুও নিশির ভয় করতে লাগল। আজকের রাত্রিটা বিচিত্র—আজ এই কৃষ্ণপক্ষের ঘন-অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যেন মতি পালদের প্রেতমূর্তি উঠে এসেছে! আকাশ বাতাস অরণ্য যেন তাদের অশরীরী ভৌতিক নিঃশ্বাসে আকীর্ণ।

বাড়ীর সামনে পৌঁছতেই চোখে পড়ল দরজার গোড়ায় সেই ঝরঝরে হার্কিউলিস্ সাইকেলটা। ইব্রাহিম দারোগা অভিসারে এসেছে। শোনা যায় দুটো বিবি আর তিনটে বাঁদী আছে লোকটার, কিন্তু আগুনে ঘৃতাহুতির মতোই তাতে তার নিবৃত্তি নেই। বিশ্বগ্রাসী লালসা যাকে বলে।

বিশাখার ঘরের দরজাটা বন্ধ—ভেতরে অন্ধকার। তার মাঝখান থেকে চাপাগলার ফিস্ ফিস্ আওয়াজ কানে এল। রুদ্ধ নিরাশ্বাসে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল নিশির। তারও যৌবন একদিন ছিল···

নিজের ঘর থেকে লণ্ঠনটা বার করে সেটাকে সে জ্বালালো। তারপর লণ্ঠন হাতে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল তার গোলাঘরের দিকে। আটশো মণ চাল সে মজুত করে রেখেছে। বর্ষার বাজারে চল্লিশ টাকা দরে

এই চালটা ছেড়ে দিলে সে শুধু লাল নয়—রক্তের মতো টকটকে লাল হয়ে যাবে। যুদ্ধের দিনকাল—মন্বন্তর যাকে বলে। কিছু যদি করে নিতে হয় তো এই-ই সুযোগ।

গোলাঘরের দরজাটা খুলতেই বাতির আলোয় আটশো মণ চালের বিশাল শুভ্র স্তূপটা ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। যেন একটা রূপোর পাহাড়। রূপোর পাহাড় বইকি। মণ প্রতি যদি আটাশ.টাকা লাভ হয়, তা'হলে আটশো মণে—

হঠাৎ একটা পচা গন্ধ এল নাকে। এখানেও পচা গন্ধ!

ঘরের টিন দিয়ে চুঁইয়েছে বর্ষার জল। সেই জলের স্পর্শে ওপরের চাল গুলো পচে গন্ধ ছড়াচ্ছে—কী বীভৎস গন্ধ! মানুষের খাদ্য,—মর্ত্য জননীর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, কী বিশ্রী বিকৃত রূপ তার!

অন্তত পঞ্চাশ ষাট মণ যে 'ন দেবায় ন ধর্মায়' গেল কোন সন্দেহ নেই তাতে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কাতর একটা খেদোক্তি: এই দুর্বৎসরে এমন অপচয়! বর্ষা পর্যন্ত বোধ হয় রাখা চলবে না। কালই মিস্ত্রী ডেকে ঘরটা সারিয়ে ফেলতে হবে, আর পচা চালগুলোও ফেলে দিতে হবে বাইরে। নইলে ওগুলোর সংস্রবে সবটা চালই নষ্ট হয়ে যাবে—ভাগ্যে সময় থাকতে তার চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা।

হঠাৎ নিশির মনে হল, কেন কে জানে, অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে মনে হল: ঠিক এই রকম একটা পচা গন্ধই সে পেয়েছিল আর একবার। শিবপুরের হাট থেকে সে ফিরছিল। চোখে পড়েছিল—মাঠের মাঝখানে একটা গলিত গোরুর দেহ আগলে বসে আছে একটা ঘেয়ো কুকুর; চারিদিক থেকে শকুনেরা উড়ে উড়ে সেই মড়াটাকে ঠোকর মারবার চেষ্টা করছে, আর কুকুরটা অস্বাভাবিক প্রচণ্ড চীৎকার করে ক্ষুধার্ত শকুন-গুলোকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

আত্মহত্যা

কাগজে বাহির হইয়াছিল : সুবিখ্যাত ধনীর এক মাত্র পুত্র, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম রত্ন পিনাকী চৌধুরী আত্মহত্যা করিয়াছে সাহারাণপুরে। এ আত্মহত্যার কোনো কারণ জানিতে পারা যায় নাই, সমগ্র ব্যাপারটাই বিস্ময়করূপে রহস্যাচ্ছন্ন।

পিনাকী আসিয়াছিল শ্বশুরবাড়ি।

এই আসিল বিয়ের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে, ইচ্ছা থাকিলেও ঘন ঘন আসিবার জো নাই। এম. এ. পরীক্ষা আসন্নপ্রায়, ভালো রেজাল্ট ওকে করিতেই হইবে। গোল্ড মেডালিষ্ট হইবার আশাটাও যে নিতান্তই দুরাশা নয় সেটা যে-কোনো অধ্যাপকই স্বীকার করিবেন।

বাস্তবিক পৃথিবীতে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে সেটা এমনি করিয়াই। সম্মুখে প্রসারিত সম্ভাবনাময় বিপুল ভবিষ্যৎ, আর সে কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। লক্ষ্মী-সরস্বতীর এমন বরপুত্র কয়টি বা দেখিতে পাওয়া যায়! ঝরিয়া অঞ্চলে ওদের মস্তবড় লাভের কোলিয়ারী, আসামের চা বাগানের শেয়ার আছে। তাছাড়া দেশে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকার জমিদারী, ধন-কুবের বলিলেও বেশি বলা হয় না। কমলা এবং বাণীর প্রচলিত দ্বন্দ্বের জন-প্রবাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াই পিনাকী রেসের সেরা ঘোড়াটির মতো গ্যালপে গ্যালপে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোর্সগুলো ডিঙাইয়া চলিয়াছে, মাথায় সার্থকতার সেরা মণিমুকুটটি পরিয়া।

মেধার সঙ্গে তাল দিয়া চলিতে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য কেহই এতটুকুও পিছাইয়া পড়ে নাই, মোটের উপর পিনাকী গল্পের আদর্শ নায়ক

শ্বশুর নামজাদা সরকারী চাকুরে, বর্তমানে পেন্সন্ লইয়া পাশ্চমেই বসবাস করিতেছেন, বাঙলা দেশের "ম্যালেরিয়া দুষ্ট" জল হাওয়া মোটেই সহ্য করিতে পারেন না, আসেনও খুবই কম। মেয়ে সুপ্রভা কিন্তু জেদ ধরিয়াই আসিল কলিকাতার কলেজে পড়িতে, থাকিবে হষ্টেলে এবং ছোট-খাটো ছুটির দিনগুলো কাটাইবে বালীগঞ্জে মাসীমার বাড়ীতে। বালীগঞ্জেই পিনাকীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তারপর যথা-নিয়মে পূর্বরাগ ঘটিল কি না জানি না, কিছুদিনের মধ্যেই মাসীমার প্রবল ঘটকালিতে পিনাকী এবং সুপ্রভার বিয়ে হইয়া গেল।

সুপ্রভার কথা বলিতে গেলেই আমার চেনা একটি মেয়ের কথা মনে পড়িয়া যায়, দু'জনে ঠিক এক রকম। আয়ত চোখ দু'টিতে একটু ভীরু সঙ্কোচ জড়াইয়া আছে, কারো মুখের পানে সহজে চাহিতে পারে না। কথা সম্পর্কে অতিরিক্ত সংযমী, বলার চাইতে যেন বেশী করিয়া অনুভব করিতে চায়, পরিহাসের সামান্যতম ইঙ্গিতেও শুভ্র কপোল দু'টি ডালিমের মতো রাঙা হইয়া আসে। পথ-চলিবার সময়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্রোহী জুতার হিল যদি বেশি করিয়া শব্দ করিতে থাকে, তাহা হইলে ক্ষুদ্র শরীরটি আরো জড়োসড়ো হইয়া যায়, অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়ে শাড়ীর আঁচলখানিকে লইয়া। সমগ্র অবয়বে এমনি একটা করুণ বিষণ্ণতা, স্নিগ্ধ শ্রী, যে ওকে দেখিলে মায়া করে।

আর এই জন্যই তো ওকে পিনাকীর এত ভালো লাগিয়াছিল। সত্যি এখানে ওর সঙ্গে আমার মত বেশ মিলিয়া যায়। শিক্ষার সংস্পর্শ যে ওর বাঙালি মেয়েত্বটুকু নষ্ট করিয়া ওকে ধার করা স্মার্টনেসের মুখোস-পরা রুক্ষ দর্শনা 'ভ্যানিটি-ব্যাগে' পরিণত করে নাই, পিনাকী এতে খুশিই হইয়াছে।

—তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল।

নীচে চায়ের পাট সারিয়া পিনাকী একটু অসুস্থতার দোহাই দিয়াই উপরে উঠিয়া আসিল, ওধরণের মজলিশ ও বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারে না। জুট প্রোডাক্‌শান ব্যাপারে বাঙলা দেশের কতখানি দাবী, বর্ত্তমান শাসন তন্ত্রে কম্যুনালিজম কতটা কাজ করিতেছে, অমুক কমিশনারের আমলে চাকুরীতে কতখানি সুযোগ-সুবিধা মিলিত, ছাগল রাম এবার ইন্‌সলভেন্‌সি লইবে কি না অথবা ক্লার্ক গেবল্‌ এবং রোনাল্‌ড কোলম্যানের মধ্যে কে ভালো অভিনেতা, ইহা লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাতামাতি করাটা পিনাকীর চোখে দেখায় অত্যন্ত বিসদৃশ আর সেইজন্যই এই সব ব্যাপারের বাইরে থাকিতেই ও ভালোবাসে।

পিনাকী উঠিয়া আসিল দোতলার খোলা বারান্দায়।

বেশ হাওয়া আসিতেছিল, এক পাশে একটা ডেক্‌ চেয়ার টানিয়া লইয়া ও গা এলাইয়া দিল। বারান্দাটার এখানে-ওখানে ঘরের খোলা দরজা হইতে খাপছাড়া আলো পড়িয়াছে, কিন্তু এই কোনটা এক টুক্‌রো তরল শান্ত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন,—আলোর ভিতর হইতে হঠাৎ এখানে আসিলে চোখ দু'টো যেন জুড়াইয়া যায়। চারিদিকে অনেকগুলি ফুল ও পাতা বাহারের টব, তা'দেরই কোনো একটিতে বোধ হয় একগুচ্ছ যুঁই ফুল ফুটিয়াছিল, বাতাসে তার অলস গন্ধটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল নেশার মতো, মনটা তাহাতে ঝিমাইয়া আসে।

• উপরে নিকষ অন্ধকার আকাশটা জুড়িয়া অসংখ্য তারা,—একটিও ফুটিতে বাকি নাই। ছায়াপথের ধোয়াটে রেখাটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, সপ্তর্ষিমণ্ডল জল জল করিতেছে একেবারে চোখের সামনে। ধ্রুব তারাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, ওধারের বড় বাড়ীটার চিল কুঠুরির আড়ালে হারাইয়া গেছে। নীচে শাহারাণপুর শহরের অসংখ্য ইলেকট্রিকের

আলো, অন্ধকার দিগন্তের অনেকখানি উপর পর্যন্ত ভাসিতেছে একটা আলোর কুয়াশা।

পিনাকীর মনে হইতে লাগিল : সুন্দর, কী সুন্দর এই জীবনটা! প্রতি অণুতে অণুতে ইহার মাধুরী, ইহার প্রতিটি পলক অমৃত রসে অভিসিঞ্চিত। এই যে শান্ত নির্মল রাত্রিটি, দ্বিধাহীন নক্ষত্রের অসংখ্য দীপোৎসব, বাতাসের এই নিঃশব্দ স্বপ্নালস অভিসার আর ভীরু প্রণয় নিবেদনের মতো যূঁইয়ের মৃদুমন্থর সুবাস, ইহারা সকলে মিলিয়া এই রাত্রিটিকে কী বিচিত্রই না করিয়া তুলিয়াছে! পৃথিবীর সংখ্যাতীত প্রয়োজনের আবর্তমুখে অনবরত অভিঘাত এবং সে সঙ্ঘাতের যে সুতীব্র যন্ত্রণা, এমন একটি অনুভবনীয় নিশীথে তাহারা সকলেই যেন শান্ত হইয়া আসে, কর্মক্ষুব্ধ দিনের ক্ষতগুলির কোনো অস্তিত্বই যেন অকস্মাৎ খুজিয়া পাওয়া যায় না।

—হঠাৎ—পিনাকী যেন এক সময়ে দার্শনিক হইয়া উঠিল : এইজন্যই মানুষ মরিতে ভয় পায়, মরিতে চায় না। জীবনের কাছে হইতে বার বার ঘা খাইয়াও সে জীবনকেই সবলে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। এমনো হয় তো হয়, যে, পৃথিবীর কাছে তাহার সমস্ত প্রয়োজন যায় নিঃশেষ হইয়া, হয়তো তাহার বাঁচিয়া থাকাটাই এক সময়ে পরম অসত্য হইয়া ওঠে, হয়তো যক্ষা রোগীর মতো প্রতিটি দুর্বহ মুহূর্তকে অতিকষ্টে টানিয়া টানিয়া চলে, তবুও নিজেকে মুছিয়া ফেলিতে চায় না এই পৃথিবীর বুক হইতে। যেখানে দৃষ্টিসীমার বাহিরে রহস্যের উত্তাল সমুদ্র অন্ধকার তরঙ্গবিক্ষেপে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, সে সমুদ্রের পরপারে কী আছে, সে কথা সাহস করিয়া বলিতে পারে কে! কে জানে, সেখানে কোন্ অমৃতলোকের দুয়ার উদ্ঘাটিত হইয়া আছে অথবা নির্নিরীক্ষ্য পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের অন্ধকূপে বাসনা-কামনা বিক্ষুব্ধ লক্ষ কোটি বিদেহী-আত্মা পথ হাতড়িয়া হাতড়িয়া পাষাণ-প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া মরিতেছে! সেখানকার আনন্দ

কলরব মানুষ শুনিতে পায় না, সেখানকার তৃষা বিদীর্ণ কণ্ঠের আর্ত-হাহাকার পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আমাদের কাণে আসিয়া বাজে না।

—এই তো সে জগৎ, কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলা চলে না। আর এখানে? এখানে বসুন্ধরা তাহার নির্ধারিত কক্ষ-কেন্দ্রের মাঝখানে অনবরত ঘূর্ণিপাক খাইয়া চলিয়াছে, কখনো তাহার এক চুল অদল-বদল হইতে দেখা যায় না। প্রতি অমাবস্যায় আকাশ কাজলের রঙে রঙীন্ হইয়া ওঠে, প্রতি পূর্ণিমায় দিগদিগন্ত জুড়িয়া তরল রূপার স্রোত বহিয়া যায়। বসন্তের বাঁশী আর বর্ষার মন্দিরায় সুর তুলিয়া চিরন্তন বাউল পথ চলিতে থাকে, শাশ্বত তাহার চলা, নীতিনির্ধারিত তাহার গতি। এখানে মানুষ ভালোবাসে, ভালোবাসা পায়, এখানে মানুষ নিজের আনন্দ সম্পদ লইয়া নিজের সীমার মাঝখানেই চরিতার্থ হইয়া ওঠে···

চরিতার্থ?

—নয় তো কী! নিজের দিকে চাহিয়াই পিনাকী এ প্রশ্নের জবাব পাইল। ওর সামনে জীবন বিচিত্র সুখ দুঃখময় বঙ্কিম ধারায় বহিয়া চলিয়া গেছে। কখনো বল্লী-বীথিকার ছায়ায় ছায়ায় তাহার যাত্রা, কখনো নীপ-নিকুঞ্জে বেণুধ্বনি বাতাসে অনুরণিত হইয়া ফিরিতেছে; আবার কখনো সাহারার কঙ্কালাকীর্ণ ধূ ধূ মরুভূমি,—পথ যেমনি দুর্গম, তেমনি জটিল।

এমনি করিয়াই তো চলিতে হইবে, এমনি করিয়াই বহু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ওদের যাত্রা সুরু হইবে জীবনের পথে। সে পথ চলায় সুপ্রভা ওর উপযুক্ত সঙ্গিনী বৈ কি। নিজের পরিকল্পনার সঙ্গে মিলাইয়াই যেন ও সুপ্রভাকে পাইয়াছে। ঠিক যেমনটি চাহিয়াছিল। সুপ্রভার গভীর চোখ দু'টির মধ্যে ও যেন কিসের ইঙ্গিত পায়, ওর ব্রীড়া-জড়িত হাসি ওর মনকে কেমন করিয়াই যেন বিলোড়িত করিয়া তোলে। ও যেন পারে ওর

দিশেহারা মনকে পথ দেখাইতে, ধ্রুবতারার শাশ্বত জ্যোতির্ময় সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া। ধ্রুবতারা! ওই বড়ো বাড়িটার আড়ালে হারাইয়া যাওয়া, ধ্রুবতারার দীপ্তি সুপ্রভার চোখেই ফুটিয়া উঠিল নাকি?

—জীবন! সত্যি কী সুন্দর জীবন! পৃথিবীতে ওরা বাঁচিতে চায়, পৃথিবীর অমৃত-পাত্রে রসধারা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, সে বেদনানন্দ মিশ্রিত অমিয়া ওরা পান করিবে, দু'জনে দু'জনকার মুখের পানে চাহিয়া পরম নির্ভরে বলিতে পারিবে :—

"উড়াবো ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ মাঝে,
দুর্গম বেগে দুঃসহতম কাজে—"

...খট করিয়া সুইচে টান পড়িল।

অন্ধকার কোণটা এক ঝলক নীলাভ তীব্র সাদা আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ছেদ পড়িয়া গেল পিনাকীর সমস্ত ভাবনা-চিন্তার উপরে। শান্ত মৃদু কণ্ঠে সুপ্রভা বলিল, "একা একা অন্ধকারে ব'সে কা'র কথা ভাবছিলে বলো তো?"

পিনাকী হাসিয়া একখানা হাত বাড়াইয়া দিল, "এসো সু, বোসো। তোমার কথাই কিন্তু ভাবছিলুম মনে মনে।"

—"বটে?" সুপ্রভা ঠোঁটের কোণে কোণে স্নিগ্ধ একটু হাসিল (এমন হাসি ওকেই মানায়) :—

—"কী সৌভাগ্য আমার! কিন্তু টুক্ ক'রে ওখান থেকে এমন ভাবে চলে যে এলে, মাথা-ধরাটা এখন একটু ছেড়েচে তো?"

—আর মিথ্যে ব'লব না সু, মাথা আমার মোটেই ধরেনি। ওই মজলিশী গাল-গল্পগুলো আমার একেবারে সয় না, সেইজন্যেই—"

—"সেই জন্যেই বীর পুরুষ বুঝি পালিয়ে এসে আত্মরক্ষা ক'রলে ?"

সুপ্রভা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল চেয়ারটার পাশে, পিনাকী ওকে টানিয়া হাতলটার উপরে বসাইয়া দিল, তারপর ওর একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে ধরিয়া ওর সোনার চুড়িগুলোকে লইয়া খেলা করিতে করিতে বলিল, "ঠি-ক ধরে ফেলেছ অভিসন্ধিটা। তোমাকে কী ক'রে ফাঁকি দেব, বলো ? মানুষের মনের খবর এক আঁচড়ে জেনে নেবার এমনি বিধিদত্ত শক্তি তোমাদের যে, কোনো কথা গোপন রাখবার উপায় নেই।"

সুপ্রভার গভীর চোখ দু'টি আরো গভীর হইয়া আসিল, ওর করুণ মুখখানা একটা অপূর্ব শ্রী-সম্পাতে যেন করুণের হইয়া উঠিয়াছে ! একথায় ও কোনো জবাব দিল না, শুধু নাড়াচাড়া করিতে লাগিল পিনাকীর আঙুল ক'টি লইয়া।

পিনাকী ওর মুখখানা নিজের মুখের কাছে টানিয়া লইল…

—"দেখছ সু, কী সুন্দর আজকের এই অমাবস্যার কালো রাতটা !"

সুপ্রভা অস্ফুটভাবে বলিল, "সুন্দর বই কি !"

…কিছুক্ষণের জন্য ওদের সামনেকার জগৎটা একটা অপরিসীম আনন্দলোকে হারাইয়া গেল…

—ঘণ্টা খানেক।

মুখ তুলিয়া সুপ্রভা বলিল, "জানো, তবু এই বারান্দাটায় একা আসতে আমার ভয় করে ?"

—"ভয় করে ? কেন বলো তো ?"

—"সে ব্যাপারটা ঘ'টেছিল আমরা এ বাড়ীতে আসবার বছর দু'য়েক আগে। তখন এখানে থাকতেন একজন বাঙ্গালী সিভিলিয়ান, অন্ সার্ভিস এসেছিলেন। তাঁরই একটি বছর পনেরোর ছেলে, তা'র যে কী খেয়াল চাপল একদিন, এই বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়তে গেল ওবাড়ির ছাতে।

যেমনি লাফ দিয়েচে, পা পড়েচে গিয়ে কার্ণিশে, আর তক্ষুণি কার্ণিশ একেবারে নীচেয়। তারপরে আর কী?"

—"মারা গেল ছেলেটা?"

বিষণ্ণ সুরে সুপ্রভা বলিল, "গেল বই কি! এতটা ওপর পড়লে কেউ বাঁচে কখনো?"

—"যাক, বেঁচেছে তা' হ'লে। জীবনটাই তো একটা ট্র্যাগে বলো সু? এখানে কারো জিৎবার পালা আর কেউ বা ক্র হারতেই এসেছে। তা'র চাইতে একবারেই সুনিশ্চিত সমাপ্তি, ফু গেল জঞ্জাল।…চমৎকার নয়?"

—"হ্যাঁ চমৎকার না আরো কিছু!" ঠোঁট উলটাইল সুপ্রভা—"এ ব'লবে উইপিং ফিলসফারের দল। মানুষের যা কিছু সুন্দর এবং মহী সে তো জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে ওঠে! তা'কে এড়িয়ে—"

পিনাকী বাধা দিল: "কিন্তু মুস্কিল এইটেই সু, কোন্‌টা যে তো সুন্দর এবং মহীয়ান, সে প্রশ্নের জবাব আজো মেলেনি। আজ যদি বলে যে জীবনটা একটা 'জুয়োলারি,' তা'র বিজ্ঞান মিথ্যে, তা'র অগ্রগ অর্থহীন, তা'র ব্যক্তিগত বলো আর লোকালই বলো, যে-কোনো র সুনির্দিষ্ট পারফেক্‌শানের স্বপ্ন দেখা নিছক আকাশকুসুম, তবে পেসিমিজম্‌কে কিছুতেই এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারবে না।"

মাথার খোঁপাটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল, সেটা ভালো করিয়া বাঁধি বাঁধিতে সুপ্রভা বলিল, "দরকার নেই উড়িয়ে। এখন তোমার ও ফিলস রাখো, আমি যাই, নীচে কায আছে।"

পিনাকী বাঁ হাতে ওকে জড়াইয়া ধরিল: "বোসো না আরো এক এত ব্যস্ত কেন?"

—"না, না, ছাড়ো লক্ষ্মীটি, নৈলে মা-ই হয়তো আমাকে খুঁজে

খুঁজতে নিজেই এখানে এসে পড়বেন। তখন কী বিশ্রী ভাববেন বলো তো?"

—"এলেনই বা। মেয়ে জামাই প্রেমালাপ ক'রচে দেখলে বিশ্রী ভাববেন আমি কক্খনো ওঁকে এতটা অনাধুনিকা ভাবতে পারিনে।"

—সুপ্রভা বিপন্ন সুরে বলিল, "সত্যি বলচি, আমার কায রয়েচে, আচ্ছা, আচ্ছা, আবার ফিরে আসব, এই কথা দিয়ে গেলুম, কেমন?"

পিনাকী আবার একা—

—প্রহরের পর প্রহর চলিয়াছে, জ্যোতিষ্ক-জগৎ একটু একটু স্থান পরিবর্তন করিতেছে, হয়তো, হয়তো একটু একটু করিয়া অন্ধকারের আবেশ ছড়াইয়া পড়িতেছে দিকে দিকে—

পিনাকীর সমগ্র অনুভূতিটা যেন অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিল: পলকে পলকে রাত্রির আয়ু নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে, বিলীয়মান মুহূর্তগুলি ওই যে নক্ষত্রলোকের পথ বাহিয়া অনন্তের সাগরের অতলতায় নিজেদের সঁপিয়া দিতে চলিয়াছে, তাহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, বিশ্লেষাতীত, ক্ষীণতর হইতে ক্ষীণতম ক্লান্ত পদধ্বনি যেন ওর অকস্মাৎ বিচিত্ররূপে স্পর্শাতুর হইয়া ওর মনের মাঝখানে ধ্বনিয়া উঠিল! তাহাদের অন্তিম দীর্ঘ নিঃশ্বাস রাত্রির উষ্ণ বাতাসের সঙ্গে—যূঁইয়ের গন্ধের অব্যক্ত বেদনার সাথে সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিয়া গেছে। তাহাদের শেষ অশ্রু আগামী কালের অরুণ আভায় শিশির রেণুতে ঝলমল করিবে।

—জীবন, সেও তো এমনি পলাতকার মতো পাখা মেলিয়া নিঃশব্দ প্রয়াণের নীরব বন্দনা মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। অন্ধকার সমুদ্রের খেয়াতরীতে পাড়ি জমাইয়া যে প্রহরগুলি চির বিস্মরণের অভিমুখে যাত্রা করিল, তাহাদের তরণীতে যে পাথেয় তাহারা লইয়া গেল, সে পাথেয় কিসের? মানুষের জীবনের সঞ্চয় হইতেই তো তাহারা একটি করিয়া

কণিকা তুলিয়া লইতেছে, কোনটি অমৃতের কোনটি বা বিষের। কিন্তু একদিন এই পাত্র রিক্ত হইবে, সুধাই বলো আর গরলই বলো, সেদিন তোমার জন্য কোনটিই তো অবশিষ্ট থাকিবে না! পিনাকীর আবার মনে হইল: পৃথিবীর কাছে যে অকর্মণ্য দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তের সমস্ত প্রয়োজন-টুকুই নিঃশেষ হইয়া ফুরাইয়া গেছে, সেও এই মাটিকেই আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিতে চায়, রহস্যমগ্ন অলক্ষ্যের প্রতি তাহার বিচিত্র বিভীষিকা। কিন্তু উপায় নাই যে!

পিনাকী যেন একটা অলৌকিক দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছে, ওর সামনে নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছে প্রদীপের শিখাটা, ম্লান, আরো ম্লান, আরো আরো—এই নিভিল বলিয়া। ওদিক্ হইতে শোনা যায় শ্মশানের ঝড়ো হাওয়ার কান্না, বুকের রক্ত তাহাতে হিম হইয়া আসে, ভাসিয়া বেড়ায় চিতার ধোঁয়ার একটা উৎকট গন্ধ। আর এদিকে কোথায় যেন শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, সাতবার উলুধ্বনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া ছড়াইয়া পড়িল নৈশ দিগ্‌দিগন্তে, সদ্যোজাত শিশুর কান্না ও স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে—

কিন্তু কী বিদ্রূপ! একটু আগে ও ভাবিতেছিল পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকাটাই সব চাইতে বড়ো, সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ একান্তই যেন ওর জন্য তাদের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে। ওর আনন্দে আকাশ বসন্তের দোলায় দুলিয়া ওঠে, ওর বেদনায় দিগঙ্গন মেঘ-মন্থর হইয়া যায়। হাসি আর অশ্রু রৌদ্র ও মেঘের লীলা সব কিছুই একান্ত ভাবে ওদের জন্য, সেইখানেই তো সৃষ্টির সফল সার্থকতা।

কিন্তু কেমন করিয়া ও উচ্চারণ করিবে এতবড় কথাটা: সফল সার্থকতা কী শুধু ওদের জন্যই। এই যে তারালোকিত কৃষ্ণা রাত্রিটি, এই অভিনব স্বপ্নাচ্ছন্নতা, ইহা একটি আজিকার রাত্রিশেষের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যাইবে? এই যে ও অন্তর দৃষ্টির সামনে তিলে তিলে

সময়ের মৃত্যু-বরণ, এইখানেই কী সমাপ্তি যবনিকা নামিয়া আসিবে? অতীতের সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। আরো সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহারই পুনরাবৃত্তি চলিবে। এমনি করিয়াই শ্লেটের মত কালো গগনের পটভূমিতে এমনি অসঙ্কোচ জ্যোতির্লেখন বারে বারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমনি করিয়াই স্বপ্নমুগ্ধ মন কালের বিদায় ছন্দে সহসা উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে। এমনি করিয়াই ফাল্গুনের তরুণ বক্ষে আগুন জ্বলিয়াছে, মিলন-মাধুরীতে অমৃত আধারটি কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া গেছে, এমনি করিয়াই আষাঢ়ের প্রথম দিনটি বারে বারে বিরহী চিত্তে অব্যক্ত বেদনায় গুরু গুরু মৃদং বাজাইয়াছে।

আর তাহাদের মতো মানব-মানবী সৃষ্টির এই শাশ্বত আবর্তনের ছন্দকে নিজেদের ক্ষণিকত্বের সঙ্গে সঙ্গেই মিলাইয়া দেখিয়াছে, ভাবিয়াছে, পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এই যে ঋতুর উৎসব এই যে ফুলের ডালি, এ বুঝি তাহাদের জন্যই সাজাইয়া আনা! এ যে কত বড় ভুল, সেটা আজ ওর কাছে একেবারেই স্বচ্ছ হইয়া গেছে। রাত্রির হারাইয়া-যাওয়া প্রহরগুলি আবার ফিরিয়া আসে, কিন্তু জীবনভাণ্ডার হইতে যে অণুটিকে তাহারা তুলিয়া লয়, সেটিকে তো আর ফিরাইয়া দেয় না।

তারপর—

সঞ্চয় যায় ফুরাইয়া, দারিদ্র্য আসে ঘিরিয়া ঘিরিয়া। মধু ক্রমশ বিষে পরিণত হইতে থাকে। পিনাকী স্বপ্ন দেখে :—

তিরিশটা বৎসর গড়াইয়া গেছে, দীর্ঘ তিরিশ বৎসর। নীল আকাশের রঙ রোদে পুড়িয়া তামাটে দৃষ্টিকটু হইয়া গেছে, সেদিকে চাহিলে চোখ জ্বলিয়া যায়। ফুলের পাপড়ি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, শুক্ল-জ্যোৎস্নার রূপ-তরঙ্গ অস্তদিগন্তে নামিয়া শবের মতো পাণ্ডুর, বিবর্ণ হইয়া গেল—

ওর মনশ্চক্ষের সম্মুখে এক বিচিত্র নাট্যশালার পটোন্মোচন হইল,

সেখানে ওই-ই নায়ক। বার্ধক্যের জড়তা ওকে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে, শীতের অস্তগামী সোনালী রৌদ্রে ওর কর্মহীন আড়ষ্ট দেহটাকে যথাসাধ্য আবৃত করিয়া একটা আরাম কেদারায় ও নিজেকে এলাইয়া দিয়াছে। বাইরের প্রাণ-চঞ্চল পৃথিবীর কাছে ও নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন হইয়া গেছে, সেদিন ওর এতটুকুও মূল্য নাই কোনখানে। সেদিনকার তরুণ দল চলিয়াছে ওকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াই, তথাকথিত সম্মানের হয়তো অপ্রতুল নাই, কিন্তু প্রয়োজনের জগতে ওর স্থান কোথায়? ও যেন লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে সযত্নে তুলিয়া-রাখা সিন্দুর-মাখানো কড়ি! হাঁ, শুধুই একটা কড়ি, তা'র বেশি নয়।

কুড়ি বাইশ বছরের একটি সুশ্রী তরুণ সুট পরিয়া টেনিস র‍্যাকেট বগলে ওর ঘরে আসিয়া ঢোকে হয়তো। বলে, "আজ কেমন আছেন, বাবা?"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ও হয়তো বলে, "একই রকম, বরঞ্চ বাতের ব্যথাটা একটু বেশি বেড়েছে বলেই যেন মনে হয়।"

ছেলেটি হয়তো জোর করিয়াই মুখের উপর একটু উদ্বেগের রেখা টানিয়া আনে: "তাই তো বড্ড কষ্ট দিচ্ছে ক'দিন থেকে! ওষুধটা ঠিক মতো খাচ্ছেন তো? আর মালিশটাও চল্‌ছে?

নিতান্ত বিরস সুরেই হয়তো পিনাকী জবাব দেয়, "হুঁ।"

ছেলে হাতের রিষ্টওয়াচটার দিকে চাহিয়া চঞ্চল হইয়া ওঠে, আজ ওর টেনিস্ কম্পিটিশন। তারপরে তেমনিই ধার-করা বিষণ্ণতার সুরে বলে, "ডাক্তার বোসকে একবার দেখালে,—আচ্ছা—"

চিন্তিতের মতো পা ফেলিয়া ছেলে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

পিনাকীর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি জাগিয়া উঠিতে উঠিতে মিলাইয়া যায়, করুণ ক্লান্ত হাসি। ওরও দেহ-মন ঘিরিয়া একদা এমনই উচ্ছল

জীবনের ঢল নামিয়া আসিয়াছিল, এমনি করিয়াই বাইরের জগতে ছিল ওর অবাধ প্রবেশ-অধিকার। কিন্তু এখন—

হয়তো চাকরটা এক পেয়ালা ওভ্যালটিন লইয়া আসে। মনটা মুহূর্তের মধ্যে বিরূপ হইয়া ওঠে: "তোর মাঈজী কোথায় রে?"

হিন্দুস্থানী চাকরটা খৈনী-খাওয়া কালো দাঁত কটা বাহির করিয়া জবাব দেয় "মাঈজী আভি পূজামে বৈঠেছেন, আসতে পারবেন না।"

—আসতে পারবেন না। ত্রিশ বৎসর পরের পিনাকী আবার ত্রিশ বৎসর আগে ফিরিয়া আসে। একদিন সামান্য একটু মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া সুপ্রভা সারা রাত না ঘুমাইয়া ওর মাথায় জলপটি দিয়াছে, সামান্য একটু জ্বরের জন্য তিনদিন বিছানার পাশ ছাড়িয়া ওঠে নাই। আর আজ। সমস্ত পৃথিবী ওর দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছে, ওকে আজ আর কেউ চায় না, এমন কি ওর একান্ত আপনার সুপ্রভাও নয়। যৌবনের আগুন ওর ভিতর হইতে কবে নিবিয়া গেছে, ও তো আর ইব্‌সেনের ডাক্তার স্টকম্যান্ নয়, যে অসঙ্কোচে দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারিবে: "The strongest man is he, who stands most alone।"

পিনাকী হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিল—ত্রিশ বৎসর পরে। হয়তো ওর কল্পনা উদ্দাম, অসংযতই হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই কি সত্যি নয়? প্রত্যেকটি দিনের বিদায়ের সাথে সাথে ওর আশা, আনন্দ, উৎসবকেও ঘিরিয়া ঘিরিয়া বিসর্জনের বাঁশি বাজিতেছে। ভবিষ্যৎ ওর জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছে বিরাট ব্যর্থতা এবং আরো পরে মৃত্যুর অলক্ষ্য অভিযান! কোথায় কেমন করিয়া, এ প্রশ্নের জবাব আজ পর্যন্তও মেলে নাই।

কিন্তু এই যে মুহূর্ত, এই যে প্রেম, এদের মাধুরীর পরিমাপ কে করিবে? জীবনে মানুষের যতটুকু কাম্য, যতটুকু তাহার প্রত্যাশা, সবটুকুই তো ও

পাইয়াছে ওর পর্ণপুট ভরিয়া। আর পাইয়াছে নারীর ভালোবাসা, সমস্ত চাওয়া-পাওয়া যাহাতে সার্থক হইয়া যায়।

এখন ও কী করিবে, কী করিতে পারে ও। কেমন করিয়াই যেন ওর মনের মাঝখানে সাড়া দিয়া উঠিল: "Porphyria's lover!" জীবনের এই মুহূর্তটিকেই কী সোণার সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া সমাপ্তির সীমা রেখা টানিয়া দেওয়া যায় না?—"এই ক্ষণটুকু শুধু হোক চিরকাল"—সে জন্যই তো Porphyria মরিয়াছে, সেইজন্যই ওওতো মরিতে পারে।

—মৃত্যু! সেই রহস্যময়ের অন্তরালে, দৃষ্টির অতীত লোকে। কিন্তু ওর আর ভয় করিতেছেনা, এমনি করিয়া বাঁধা ধরা নিয়ন্ত্রিত ব্যর্থতাকে আজ ওর প্রয়োজন নাই। যাহাকে জানা যায় না, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া শুধু বিচিত্র বিভীষিকার তরঙ্গই উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতি যাত্রা করিবার দুঃসহ আকাঙ্ক্ষা আজ ওর মনে উদগ্র হইয়া উঠিল। ইহাই তো অভিযানের অনুপ্রেরণা, সাহারার মরুভূমি অতিক্রম করিয়া, আফ্রিকার মৃত্যু তরঙ্গিত নীল অরণ্যের মাঝখানে···

পিনাকীর মন একটা বিচিত্র প্রশান্তিতে স্থির হইয়া গেল।

সুপ্রভা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

—"বাঃ রে, এখনো এখানে চুপটি করে বসে! কত রাত হ'য়ে গেল, নীচে চলো, খাবার দিয়েছে যে।"

সমস্ত শাহারাণপুর সহরটা ঝিমাইয়া পড়িয়াছে, থামিয়া গেছে জীবনের সামান্যতম কোলাহল টুকুও। চারিদিকে মৃত্যুর প্রশান্তি। পিনাকী গভীর স্বরে বলিল, "ব্রাউনিঙের সেই লাইনটা তোমার মনে পড়ে সু? 'Who knows but the world may end to-night?"

সুপ্রভা বিস্মিত সুরে বলিল, "হঠাৎ ও লাইনটা মনে পড়বার মানে?"

পিনাকী জোরে হাসিয়া উঠিল, টানিয়া টানিয়া হাসি, থামিতেই চায় না। বলিল, এমনি। কিন্তু আজ রাত্রে তোমাকে ভা—রী সুন্দর দেখাচ্ছে, এত সুন্দর যেন কখন দেখিনি।"

—আজ রাত্রে! কথাটা পিনাকীর মনে বার বার করিয়া বলিয়া উঠিতে লাগিল: আজকে পৃথিবী শেষ না হইয়া গেলেও নিজের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের ভার তো ওর নিজের উপরেই! বিদায় যদি লইতেই হয়, তাহা হইলে অমৃত পাত্র পরিপূর্ণ থাকিতে থাকিতেই সে বিদায় লইতে হইবে। আনন্দের চরমতম মুহূর্তটিতেই সমাপ্তির ছেদ পড়িয়া যাক্—

কিন্তু সুপ্রভা তেমনি আশ্চর্য হইয়াই চাহিয়া রহিল ওর মুখের দিকে।